সুরের আগুন

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় বি-এ,

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক :—
শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
০২।১ নং টালিগঞ্জ রোড, কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রেস
২০, ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

ভূমিকা

"সুরের আগুন" রাশিয়ার জগদ্বিখ্যাত কথাশিল্পী ঋষি টলষ্টয়ের সর্ব্বজনপ্রিয় উপন্যাস Tue Kreutzar Sonataর অনুবাদ। বাঙালী পাঠক বিচার ক।.বেন—ইহা সরল, স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল করিবার চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছে।

বাংলায় অনুবাদ সাহিত্য যে এখনও খুবই কম, ইহাতে বোধ হয় মতদ্বৈধ নাই। এইজন্যই আমার অনুদিত "টলষ্টয়ের গল্প" পাঠ করিয়া অনেকেই আমাকে টলষ্টয়ের অন্যান্য রচনা বাঙালী পাঠককে উপহার দিতে বলেন, তাঁহাদের উৎসাহের ফলেই এই "সুরের আগুন" প্রকাশিত হইল।

ইহা বাঙালী পাঠক-পাঠিকার সমাদর লাভ করিলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব। ইতি—

রত্নপুর, বরিশাল
আশ্বিন, ১৩৪৩

বিনীত
শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়

১

তখন শীত যায় যায়।

আমরা রেল-গাড়ীতে চলিয়াছি। দুইদিন ও এক রাত্রি কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু গাড়ী চলিয়াছেই। কি দীর্ঘ এই পথ! কত ষ্টেশনে কত লোক উঠিল, কত লোক নামিয়া গেল; কিন্তু এই পথের প্রথম থেকেই আমরা একটি গাড়ীতেই আছি, কখনও শুইয়া আবার কখনওবা বসিয়া।

আমাদের গাড়ীতে আমি ছাড়া আরও তিনজন প্রথম থেকেই ছিলেন। এই তিনজনের একজন ছিলেন মহিলা। তাঁর ভরা যৌবনে তখন অনেকটা ভাঁটা পড়িয়াছে, বহুদিনের দুঃখ ভোগের মলিন ছায়া তাঁর মুখখানি ঢাকিয়া রাখিয়াছে। সঙ্গে তাঁরই বন্ধু একজন ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। ভদ্রলোকটীর বয়সও প্রায় চল্লিশ, তাঁর কাপড় চোপড় একেবারে নূতন ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। আর একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোকও সেখানে ছিলেন। বয়সে তিনি বৃদ্ধ হন নাই বটে, তবে বার্দ্ধক্যের পূর্ব্বেই তাঁর কোঁকড়ান চুলগুলি পাকিয়া গিয়াছিল। ইনি গাড়ীর একপাশে, সকলকে ছাড়িয়া আলাদা হইয়া বসিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে গাড়ীর ভিতরে এ-জিনিস-সে-জিনিসের দিকে, কখনও জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিতেন, আবার কখনও বা বই কিংবা খবরের কাগজ লইয়া এক মনে পড়িতেন। যাই হোক, মাঝে মাঝে তিনি কি এক অদ্ভুত শব্দ করিতেছিলেন—সেটা কাসি, কি হাসি, কি কান্না তাহা কিছুই বুঝিতে পারা গেল না। তাঁর হাব ভাব দেখিয়া এটা স্পষ্টই বুঝা গেল যে, আর কোন যাত্রীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে তিনি নিতান্তই নারাজ।

কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি খুব সংক্ষেপে এবং রুক্ষভাবে জবাব দিয়াই, হয় জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া চাহিয়া থাকেন, না হয়, নিজের বইখানি পড়িতে আরম্ভ করেন, কিংবা একটা নিতান্ত পুরাতন ব্যাগ থেকে চা তৈয়ারি করিবার জিনিসপত্র সব বাহির করেন। এইভাবে প্রায় একদিন কাটিয়া গেল। কি অদ্ভুত লোক!

আমি যে বেঞ্চিতে বসিয়াছিলাম তারই সামনের বেঞ্চিতে এক-কোণে তিনি বসিয়াছিলেন। তাঁর সঙ্গে একটু আলাপ করতে আমার

বড়ই ইচ্ছা হইতেছিল। কয়েকবার চেষ্টাও করিলাম, কিন্তু যতবারই তাঁর সঙ্গে চোখে চোখে দেখা হইল ততবারই তিনি মুখ ফিরাইয়া লইয়া তাঁর বইয়ে মন দিলেন, কিংবা জানালা দিয়া বাহির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

পরের দিন সন্ধ্যার সময় ট্রেণ একটা প্রকাণ্ড ষ্টেশনে থামিল। চায়ের জল আনিবার জন্য ভদ্রলোকটি একবার নামিলেন।

মহিলা এবং তাঁর বন্ধুটিও নামিয়া ষ্টেশনের খাবারের ঘরে ঢুকিলেন। একটু পরে জানিতে পারিলাম যে নূতন পোষাক পরা এই ভদ্রলোকটি একজন ব্যারিষ্টার। তাঁরা নামিয়া যাইতেই অনেক নূতন যাত্রী গাড়ীতে উঠিল। এই নূতন যাত্রীদের মধ্যে একজন ছিলেন খুবই ঢেঙা এবং বুড়া, তাঁর গায়ে একটা লম্বা কোট। তাঁর কথাবার্ত্তা শুনিয়া বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল যে, তিনি একজন সদাগর। তাঁর প্রকাণ্ড ব্যবসায় আছে। যে, বেঞ্চিতে মহিলা এবং তাঁর ব্যারিষ্টার বন্ধুটি বসিয়াছিলেন তারই ঠিক সামনের বেঞ্চিতে সেই সদাগর বসিলেন। তাঁরই একপাশে একটি যুবক বসিয়াছিল। কোন এক সদাগরের কেরাণী বলিয়াই তাকে মনে হইল। বৃদ্ধ ব্যবসায়ী এই যুবক কেরাণীর সঙ্গে গল্প আরম্ভ করিয়া দিলেন। আমি তাঁদের সামনের বেঞ্চিতে অল্প একটু তফাতে ছিলাম। তখন ট্রেণ থামিয়াছিল বলিয়া আমি তাঁদের কথাবার্ত্তা খানিকটা শুনিতে পাইলাম।

বৃদ্ধ বণিকটি যাচিয়াই বলিতে লাগিলেন যে, পরের ষ্টেশনের নিকটেই তাঁর জমিদারি আছে, তিনি সেই জমিদারিতেই যাইতেছেন। তারপর ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি লইয়া তাঁরা কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। একটু পরেই তাদের কথা আরম্ভ হইল একটা মেলা সম্বন্ধে। সেবার সেই মেলায় এক ধনী সদাগর তাঁর বন্ধুদের লইয়া পাল্লা দিয়া কি রকম

মদ খাইয়াছিলেন এবং কত ধুমধাম করিয়াছিলেন, কেরাণীটি তাই একটু বিশদভাবে বর্ণনা করিল। কিন্তু বৃদ্ধ বণিক তার কথা শেষ হইতে না হইতেই বলিতে আরম্ভ করিলেন—"এ আর কি! আমাদের বয়সের কালে এক একটা মেলায় এক একটা বড়লোক মদে আর মেয়েমানুষে কি টাকাটাই না খরচ করেছে! তার তুলনায় এখন আর কি হচ্ছে ছাই? আমিও অনেকবার এরকম আমোদ করেছি। এখন বুড়ো হয়ে পড়েছি আর সে স্ফুর্ত্তি নেই, সে উৎসাহ নেই।"

এই কথা বলিয়া তিনি নিজেই খুব গর্ব্ব অনুভব করিতে লাগিলেন। তাই কেরাণীটিকে আর মোটেই কথা কহিতে না দিয়া তিনি নিজেই আবার বলিতে লাগিলেন,—"দেখ একবার মদ খেয়ে এমন কাণ্ড ক'রে ফেলেছিলুম যে, তা আর লোকের সামনে বলা যায় না।"

কেরাণীটির কাণে কাণে তিনি তারপর কি বলিলেন! শুনিয়া ত সে একেবারে হো হো করিয়া এমনি হাসিল যে গাড়ীটার একদিক থেকে আর এক দিক পর্য্যন্ত বাজিয়া উঠিল। বৃদ্ধ নিজেও দাঁতগুলি সবই একেবারে বাহির করিয়া হাঃ হাঃ করিয়া খানিকক্ষণ হাসিলেন।

তাদের এই কথাবার্ত্তা আমারত একেবারেই ভাল-লাগিল না। তাদের কাছে কোন ভাল কথা শুনিব এ আশাও আমার আর রহিল না। আমি ভাবিলাম যতক্ষণ ট্রেণটি ষ্টেশনে থাকিবে ততক্ষণ প্লাটফর্ম্মে খানিকটা পায়চারী করিব। উঠিয়া গাড়ীর দরজা অবধি গিয়াছি, এমন সময়েই দেখিলাম সেই মহিলা এবং তাঁর ব্যারিষ্টার বন্ধুটি ষ্টেশনের খাবার ঘর থেকে বাহির হইয়া গাড়ীর দিকে ফিরিয়া আসিতেছেন। তাঁরা কথা কহিতেছিলেন আর প্রাণ খুলিয়া হাসিতেছিলেন।

আমাকে নামিতে দেখিয়াই ব্যারিষ্টার বলিলেন, "যাচ্ছেন কোথা মশায়? আর ত সময় নেই, এখুনি শেষ ঘণ্টা পড়বে।"

সত্যই খানিকটা যাইতে না যাইতেই শেষ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। আমি তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। আসিয়াই দেখি মহিলাটি আর ব্যারিষ্টার খুব গল্প করিতেছেন। তাঁদের মুখে চোখে আনন্দ আর ধরে না।

সেই বালিকাটি তাঁদের সামনে বসিয়া তাঁদেরই কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন, আর মাঝে মাঝে নাক সিটকাইয়া, মুখ বাঁকাইয়া, ভ্রূ কুঁচকাইয়া তাঁর নীরব অসম্মতি প্রকাশ করিতেছিলেন।

আমার বসিবার জায়গায় আমি ফিরিয়া আসিতেছি তখন একটু হাসিয়া ব্যারিষ্টারটি মহিলাকে বলিলেন, "তারপর সে তার স্বামীকে সোজা ব'লে দিলে যে তার সঙ্গে সে একত্রে আর থাক্‌তে পারবেনা, থাক্‌বেও না। কারণ—"

বাকীটা আর শুনিতে পাইলাম না, কারণ আমিও যেমনি আসিয়া আমার জায়গায় বসিলাম, অমনি কয়েকজন নূতন যাত্রী জিনিস্‌পত্র লইয়া গাড়ীতে উঠিল; আর খানিকক্ষণ ধরিয়া সেখানে এমন একটা হট্টগোল বাঁধিয়া গেল যে, আর কোন কথাই আমার কাণে আসিয়া পৌঁছিল না। গোলমাল থামিয়া যাওয়ার পর আবার ব্যারিষ্টারের কথা শুনিতে পাওয়া গেল। প্রথমে একটি মহিলা আর তার স্বামীর বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা হইতেছিল, এবারে সাধারণ ভাবেই স্বাধীন বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদের কথা আরম্ভ হইল।

ব্যারিষ্টার ভদ্রলোকটি বলিতেছিলেন যে, সমস্ত ইউরোপেই এখন বিবাহ-বিচ্ছেদের সমস্যা সকল লোকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এমনকি এই রুশ দেশেও বিবাহ-বিচ্ছেদ এখন আগের চেয়ে বেশী হইতেছে।

তিনিত খুব বলিতে লাগিলেন। তখন গাড়ীর ভিতরে সমস্ত

গোলমাল থামিয়া গিয়াছে, আর গাড়ীর সমস্ত লোকই তখন তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া আছে। তাঁর কিন্তু এটা একেবারেই খেয়াল ছিল না। তারপর তিনি যখন বুঝিলেন যে, শুধু তিনিই বক্তা এবং আর সকলেই নীরব শ্রোতা তখন তিনিও চুপ করিলেন।

তারপর একটু হাসিয়া বৃদ্ধ বণিকের দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন, "আগেকার দিনে এ সব ব্যাপার নিশ্চয়ই ছিল না, কি বলেন ?"

ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটি উত্তর দিতে যাইতেছিলেন এমন সময় ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। তিনি অমনি মাথা থেকে টুপীটা খুলিয়া হাতে লইয়া মনে মনে কি এক মন্ত্র আওড়াইতে লাগিলেন। ব্যারিষ্টার মহাশয় ততক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তারপর তাঁর প্রার্থনা শেষ হইলে টুপীটা মাথায় দিয়া ভাল হইয়া বসিয়া বলিতে লাগিলেন :—

"দেখুন, আগেকার দিনেও এসব ব্যাপার হ'ত। বিবাহ-বিচ্ছেদ ব্যাপারটা যে একেবারেই নতুন তা নয়, তবে এখন যত হচ্ছে তখন তত হ'ত না, খুব কমই হ'ত। আজকাল ত যত বিয়ে তত ছাড়াছাড়ি হবেই। মানুষ যা সভ্য আর শিক্ষিত হ'য়ে উঠেচে তা দেখ্‌লে ত তাক্ লেগে যায় !"

ট্রেণ যতই দ্রুত চলিতে লাগিল তার অতি কর্কশ ঘড়্ ঘড়্ শব্দ ততই বেশী হইতে লাগিল। কাজেই তখন যে কি কথা হইল তা আমার পক্ষে শোনা খুব শক্ত হইয়া পড়িল। আমি তাদের একটু কাছে গিয়া বসিলাম। আমার কাছে যে ভদ্রলোকটি কখনও বই কখনও বা খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন, তাঁরও এই কথাগুলি শুনিবার খুব ইচ্ছা হইতেছিল। তিনিও শুনিতে চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু তিনি যেখানে ছিলেন সেইখানেই রহিয়া গেলেন, সেখান হইতে একটুও নড়িলেন না।

আমি এখন বেশ শুনিতে পাইলাম। বৃদ্ধ ব্যবসায়ী আধুনিক শিক্ষা এবং সভ্যতার প্রতি একটু কটাক্ষপাত করিয়া কথা কহিয়াছেন বলিয়া মহিলাটি একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শিক্ষাটা দোষের হ'ল কিসে? আগেকার মত বিয়ে করা যে ভাল একথা কিছুতেই বলা যায় না। বর এবং ক'নে কেউ কাউকে এখনকার মত এত দেখে শুনে নিত না। বিয়ের আগে তারা বুঝ্‌তেই পার্‌ত না যে, তাদের দুজনের মধ্যে প্রকৃত ভালবাসা আছে কিনা কিংবা বিয়ের পরেও তাদের ভালবাসা হবে কিনা। কে কাকে বিয়ে করলে এই তারা জান্‌তে পারত না। এরই ফলে তাদের জীবনটা চিরকালের জন্য দুঃখময় হয়ে থাকত। এইটেই বুঝি আপনাদের মতে খুব ভাল?"

ব্যবসাদার ভদ্রলোকটি আবার সেই কথাই বলিলেন, "না তা কেন? তখন সকলেই অসভ্য ছিল কি না। এখনকার দিনে মানুষ সভ্যতা ও শিক্ষার আলো পেয়েছে।"

কিন্তু মহিলা যে প্রশ্ন করিয়াছেন তার উত্তর তিনি দিলেন না।

এই কথা শুনিয়াই ব্যারিষ্টার তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামী-স্ত্রীর অন্তরের অনৈক্যের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্কটা কি, তা ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিলে খুবই খুসী হব।"

বৃদ্ধ বণিকের কিছু বলিবার পূর্ব্বেই মহিলা বলিয়া উঠিলেন, "না মশায়, সেদিন আর নেই।"

ব্যারিষ্টার তাঁকে বাধা দিয়া বলিলেন, "ওঁকেই বল্‌তে দিন না। ওঁর নিজের মতটা উনিই ভাল ক'রে আমাদের বুঝিয়ে দিন, দেখা যাক।"

ব্যবসায়ী বলিলেন, "শিক্ষা থেকে নানা রকম ভ্রম জন্মায়।"

আমরা তখন সকলেই খুব উৎসাহের সহিত শুনিতেছি। আমাদের

দিকে ফিরিয়া চাহিয়া মহিলাটি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "পরস্পরের মধ্যে যাদের ভালবাসা জন্মায়নি এমন পুরুষ ও নারীর বিয়ে দেওয়া হয়। তারপর যখন এই সব স্বামী-স্ত্রী একত্রে সুখে শান্তিতে বাস করতে পারে না যখন তাদের জীবন চিরকালের জন্য দুঃখে ভরে ওঠে, তখন সকলেই বিস্মিত হয়, সকলেই নিন্দা করে। এই রকম ব্যাপারই ত চলে আসচে! মানুষের জীবন নিয়ে, সুখ-শান্তি নিয়ে এ রকম খেলা করা আর চলবে না। গরু চলে রাখালের ইচ্ছা মতন, রাখালকে সে মান্তে বাধ্য, কারণ তার নিজের হিতাহিত জ্ঞান নাই। কিন্তু মানুষের সঙ্গে জানোয়ারের মত ব্যবহার করা ত আর চল্‌বে না। কারণ প্রত্যেক মানুষেরই হিতাহিত জ্ঞান আছে, তার নিজেরও ইচ্ছা বলে জিনিষটা আছে, আশা ও ভালবাসা আছে। সেটা তার নিজের অন্তরের জিনিষ। এখানে অন্যের শাসন টিক্‌বে কেন?"

ব্যবসায়ী বলিলেন, "বাপ-মা বা অন্য অভিভাবক ছেলে মেয়ের বিয়ে দিয়ে তাদের সঙ্গে পশুর মত ব্যবহার করে—একথা বলা নিতান্তই অসঙ্গত। কারণ পশুর জন্য কোন আইন, বিধান বা শৃঙ্খলা তৈরি হয় না, মানুষের জন্যই হয়েচে।"

মহিলা অমনি বলিলেন, "বেশ ত, আপনি বুঝিয়ে দিন যে, পুরুষ এবং স্ত্রীর মধ্যে যদি ভালবাসা না থাকে, যে মনের টানে মানুষের প্রকৃত মিলন হয় তা যদি না-ই থাকে, তা হলে তারা একসঙ্গে কি ক'রে থাকবে?"

খুব দৃঢ় এবং গম্ভীরস্বরে বৃদ্ধ বণিক বলিলেন, "পূর্ব্বে এদিকে মানুষের নজর ছিল না। আজকালই এই কথাটা উঠ্‌চে। এখন এইটেও একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েচে। ব্যাপারটা এখন দাঁড়িয়েচে এই —যে মুহূর্ত্তেই অতি সামান্য একটু অসুবিধা হয় সেই মুহূর্ত্তেই স্ত্রী

স্বামীকে ব'লে থাকে—তোমার মত স্বামীর সঙ্গে আমি আর থাক্‌ব না।' শিক্ষিত ও সভ্যদের ত কথাই নেই, এমন কি সরল কৃষকদের মধ্যেও এই সভ্যতার আলোক প্রবেশ করেচে। একটু সামান্য গোলযোগ, অতি তুচ্ছ একটু অসুবিধে হলেই আজকাল পাড়াগাঁয়ের একজন কৃষকের স্ত্রীও ব'লে ওঠে—'এই নাও তোমার জিনিষ-পত্তর, আর রইল তোমার এই ঘর-দোর। তোমার সঙ্গে আমি আর থাক্‌ব না, আমার পোষাবে না; আমি চল্লুম জ্যাকের সঙ্গে। জ্যাক্ তোমার চেয়ে দেখ্‌তেও ঢের ভাল'। এর চেয়ে আর অদ্ভুত ব্যাপার কি হ'তে পারে? সঙ্কোচ এবং ভয় থাকাটাই স্ত্রীলোকের সব চেয়ে বেশী দরকার।"

এদিকে বৃদ্ধের পাশে যে যুবক কেরাণীটি বসিয়াছিল সে একবার মহিলাটির মুখের দিকে, ব্যারিষ্টার ও আমার দিকেও একবার চাহিল। বৃদ্ধের যুক্তি কে কি রকমভাবে গ্রহণ করে তাই দেখিয়া সে হয় বৃদ্ধকেই সমর্থন করিবে, না হয় তাঁর কথা হাসিয়াই উড়াইয়া দিবে, ইহাই ছিল তার অভিপ্রায়।

মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের ভয়?"

ব্যবসায়ী উত্তর দিলেন, "স্বামীর কাছে ভয়। স্বামীকে স্ত্রী নিশ্চয়ই ভয় করবে।"

অত্যন্ত বিরক্তির সুরে মহিলা বলিলেন, "সেদিন চলে গেছে মশায়।"

"না, সেদিন যায়নি, যেতেও পারে না। প্রথম নারীর উৎপত্তি হয়েছিল পুরুষ থেকে। এই আদি নারীর মতই স্ত্রীলোককে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত থাকতে হবে।"

ইহা বলিয়াই, নিজেকে এই তর্কযুদ্ধে বিজয়ী বীর মনে করিয়া বৃদ্ধ বণিক এমনভাবে মাথা নাড়াইতে লাগিলেন যে কেরাণীটি তৎক্ষণাৎ

স্থির করিয়া ফেলিল এবং কোন কথা না কহিয়াও শুধু এই হাসি দিয়াই বৃদ্ধের কথায় সায় দিয়া গেল।

মহিলা বলিলেন, "পুরুষেরা এই রকমই ব'লে থাকে। স্ত্রীলোকের বেলায় তাদের যুক্তিই এই। আপনারা নিজে স্বাধীন থাক্‌বেন আর মেয়েদের খাঁচায় আটকে রাখবেন। নিজেদের সব রকমের স্বাধীনতা দিতে আপনারা কোথাও কোন ত্রুটি রাখেন নি।"

ব্যবসায়ী বলিলেন, "আমাদের ত কেউ হুকুম দেবার নেই। যদি কোন পুরুষ বাড়ীর বাইরে কোনখানে কোন কুকাজও করে তাতে তার নিজের ঘরে ত সন্তান-সৃষ্টি হয় না। কিন্তু এক্ষেত্রে নারী একেবারেই নিঃসহায়। নেহাৎ ক্ষণভঙ্গুর কাচের পাত্রটিরই মত তার অবস্থা।"

এমন গম্ভীরভাবে এবং জোরের সহিত তিনি এই কথা কয়েকটি বলিলেন যে, সেখানে যাঁরা শ্রোতা ছিলেন তাঁরা সকলেই চুপ করিলেন, যেন সকলেই তাঁর কথা মানিয়া লইলেন। এমন কি মহিলাও বুঝিতে পারিলেন যে তাঁর হার হইয়াছে, কিন্তু তিনি হার স্বীকার করিতে রাজী হইলেন না। কাজেই একটু পরেই তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ। তা হলেও এটা আপনাকে স্বীকার কর্‌তেই হবে যে, পুরুষেরও যেমন সুখ দুঃখের অনুভূতি আছে, নারীরও তেমনি আছে, পুরুষেরও যেমন ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি বলে জিনিষটা আছে নারীরও তেমনি আছে। তাই যদি হয়, তা হলে বলুন দেখি স্ত্রী যদি স্বামীকে ভাল না বাসে তবে সে কি করবে?"

একটু ক্রোধের স্বরে ব্যবসায়ী বলিলেন, "স্ত্রী যদি স্বামীকে ভাল না বাসে? এতে কোনই আশঙ্কার কারণ নেই। স্বামীকে ভালবাসতে সে শিখবে।"

এই রকম অপ্রত্যাশিত যুক্তি যুবকটির বেশ মনের মত হইল,তাই সে কি রকম একটা অস্পষ্ট শব্দ করিয়া ব্যবসায়ীর এই কথাই সমর্থন করিল।

মহিলা বলিলেন, "ভালবাসতে যদি সে না শেখে? সে ত কিছুতেই তাকে ভালবাসবে না, কারণ যেখানে মনের টান নেই ভালবাসার অভাব ত সেখানে হবেই। জোর ক'রে ত আর ভালবাসা জমানো যায় না।"

ব্যারিষ্টার ভদ্রলোকটি এই সময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি কোন স্ত্রী ব্যভিচারিণী হয় তা হলে তার স্বামী কি করবে?"

ব্যবসায়ী বলিলেন, "এ রকম অবস্থায় স্বামীর কিছুই মনে না করা উচিত। তার তখন একমাত্র কর্ত্তব্য হচ্ছে স্ত্রী যাতে আর কুপথে না যায় তাই করা।"

ব্যারিষ্টার আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধ করবার উপায় সত্ত্বেও যদি স্ত্রী কুপথে যায় তা হ'লে?"

ব্যবসায়ী বলিলেন, "স্বামী আন্তরিক চেষ্টা করলেও স্ত্রী এ রকম কোথায় হয় আমি ত জানিনে।"

সকলেই তখন চুপ। কেরাণীটি তার জায়গা ছাড়িয়া খানিকটা কাছে আসিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইত আমাদের দেশেই একটা ঘটনা হয়েছিল। সে এক কেলেঙ্কারীর ব্যাপার! সে ছিল এক অদ্ভুত মেয়ে মানুষ; তার চরিত্রটা একেবারেই ভাল ছিল না। খুব সুন্দর সুন্দর কাপড় চোপড় প'রে সেজে বেরুত। তার স্বামী যেমনি খুব ভাল মানুষ ছিল, তেমনি ছিল খুব বুদ্ধিমান আর রসিক। স্ত্রীটি এক দোকানের একটা ছোকড়ার সঙ্গে খুব হাসি ঠাট্টা ফক্কুরী চালাত। স্বামী বেচারা কয়েক দিনেই বুঝ্‌তে পারলে যে ব্যাপার ভারি গুরুতর। সে তখন স্ত্রীর এইরকম ব্যবহার বন্ধ করবার চেষ্টা

করলে, স্ত্রীকে কত উপদেশ দিতে লাগল, কত রকম ক'রে তার মন জুগিয়ে চল্‌তে লাগল। স্ত্রী তার কোন কথায়ই কাণ দিলে না, তার যা খুসী তাই করতে লাগল। তারপর সে তার স্বামীর টাকা পয়সা পর্য্যন্ত গোপনে গোপনে সরাতে লাগল! স্বামী বেচারা আর ধৈর্য্য রক্ষা করতে পার্‌লে না, একদিন স্ত্রীকে ধ'রে খুব ক'সে কয়েক ঘা বসিয়ে দিলে। তার ফলে হ'ল এই যে, ভাল হওয়াত দূরের কথা স্ত্রীটি দিন দিনই আরও খারাপ হ'তে লাগল, শেষে একদিন একটা ইহুদীর সঙ্গে বেরিয়ে পালিয়ে গেল। তার স্বামীর এ অবস্থায় কি আর করবার ছিল? স্ত্রীকে একেবারে ত্যাগ করলে, কিন্তু আর বিয়ে করলে না! এখনও তার সেই কুমারের জীবনই চলেচে; আর তার স্ত্রী এখন অধঃপতনের একেবারে শেষ সীমানায় গিয়ে পৌছেচে। এই ত হয়েচে ব্যাপার।"

আগুনের মত একেবারে দপ্‌ করিয়া জলিয়া উঠিয়া ব্যবসায়ী বলিলেন, "এই স্বামীটি ভয়ানক বোকা। সে যদি প্রথম থেকেই তার স্ত্রীকে সদুপদেশ দিত, শিক্ষা দিত, ভাল করবার চেষ্টা কর্‌ত; মনের মত করবার জন্য গোড়া থেকেই লেগে থাক্‌ত, তা হ'লে তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে যেতে পার্‌ত না, আজ তার সঙ্গে সুখে ও আনন্দেই সে থাক্‌ত। প্রথম থেকেই সাবধান হ'তে হয়, বুঝে সুঝে চল্‌তে হয়। সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে ভাল করবার চেষ্টা করলে কি সুফল ফলে না?

এই সময়ে পরের ষ্টেশনের যাত্রীদের টিকিট চাহিবার জন্য গার্ড আসিয়া আমাদের গাড়ীতে ঢুকিলেন। ব্যবসায়ী তাঁর টিকিটখানি দিলেন। গোলমাল থামিয়া গেল! তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, "হ্যাঁ, মেয়েমানুষদের যথাসময়েই সৎশিক্ষা দিতে হয়, নইলে সবত নষ্ট হবেই। গোড়া কেটে ডগে জল ঢেলে আর কি হবে?"

আমি এতক্ষণ চুপ করিয়া কেবল শুনিতেছিলাম, কিন্তু আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না, বলিলাম, "দেখুন, এই যে একটু আগেই আপনি বল্‌ছিলেন পুরুষরা সেই মেলায় গিয়ে যে সব কাণ্ড করেছিলেন তা লোকের সামনে বল্‌তেও লজ্জায় মাথা নুয়ে পড়ে, তার সঙ্গে আপনার একথার সামঞ্জস্য কোথায় ?"

তিনি জবাব দিলেন, "ও সেই কথা! সেত একেবারেই আলাদা ব্যাপার।"

তিনি আর কিছু বলিলেন না।

তারপরেই রেলের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। তিনি উঠিলেন ; বেঞ্চিটার নীচে থেকে একটা ব্যাগ টানিয়া বাহির করিয়া, গরম জামাটা ভাল করিয়া আঁটিয়া গায়ে দিয়া প্ল্যাট্‌ফরমে নামিয়া পড়িলেন।

২

তিনি ত নামিয়া গেলেন, আর সকলেই তখন কথা কহিতে আরম্ভ করিল।

কেরাণীটি বলিল, "এই বুড়োও দেখচি সেই প্রাচীনকালের লোক-দের মত খুব কড়া শাসনের পক্ষপাতী।"

মহিলা বলিলেন, "সমাজের অত্যাচারের একটি জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। নারী ও বিবাহ সম্বন্ধে কি জঘন্য ধারণা!"

ব্যারিষ্টার মহাশয় তাঁর অভিমত জানাইলেন,—"বিবাহ সম্বন্ধে পৃথিবীতে সব চেয়ে বেশী শিক্ষিত ও মার্জ্জিত ইউরোপের যা ধারণা তা আমাদের দেশের লোকের এখনও হয়নি।"

মহিলা বলিলেন, "যেখানে ভালবাসা নেই, সেখানে মিলন নেই।

যেখানে পুরুষ ও নারীর মধ্যে মনের টান নেই, সেখানে বিয়ে বিয়েই নয়। কারণ প্রকৃত ভালবাসা দ্বারা—প্রেমের দ্বারাই বিবাহ বন্ধন পবিত্র হয়। এই সোজা কথাও এই লোকগুলো কিছুতেই বুঝ্‌বে না, এইটিই সব চাইতে আশ্চর্য্য।"

বিবাহ লইয়া আবার কখনো কারও সঙ্গে আলোচনা করিতে হইলে, যাতে এই সব যুক্তি সে প্রয়োগ করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে কেরাণীটা এই কথাগুলি ভারি মন দিয়া শুনিতেছিল, আর বেশ করিয়া মনে রাখিবারও চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু মহিলা যখন কথা কহিতে-ছিলেন সেই সময় আমাদের পাশে এক শব্দ শুনিতে পাইলাম—চাপা হাসি কিংবা চাপা কান্নারই মত। পাশের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম—যে বুড়া ভদ্রলোকটি এক পাশে কারও সঙ্গে কথা না কহিয়া, গম্ভীর ভাবে মাঝে মাঝে বই বা খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন, তিনি একেবারে আমাদের কাছে আসিয়াছেন। এই আলোচনাটা শুনিবার জন্য তাঁর অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছিল বলিয়া তিনি আমাদের একেবারে কাছে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, আমাদের তা খেয়াল ছিল না। বৃদ্ধের মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, অন্তরে একটা ভীষণ যন্ত্রণা ক্রমাগত হইতে থাকিলে মুখের চেহারাটা যে রকম হয় তাঁর মুখখানা তখন তেমনি একটা বিকৃতভাব ধারণ করিয়াছিল। তাঁর ভিতরে একটা বেদনাভরা চাঞ্চল্য অনুভব করিলাম। কাজেই আমাদের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, আমরা যে শব্দটা শুনিয়াছিলাম তা তাঁরই চাপা কান্নার শব্দ। তাঁর অন্তরে এমন একটা তীব্র বেদনার আঘাত লাগিয়াছে যে, তিনি আর নিজেকে সাম্‌লাইতে পারেন নাই, চাপিতে গিয়াও কান্না চাপিতে পারেন নাই। তিনি তখন কাঁপিতেছিলেন। আমরা সকলেই চুপ করিলাম।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি অতি কষ্টে মহিলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকম ভালবাসার কথা আপনি বল্‌ছিলেন? কোন ভালবাসায় বিবাহ পবিত্র হয়?"

তাঁর অবস্থা দেখিয়া মহিলার মন করুণা ও সমবেদনায় পূর্ণ হইয়া উঠিল, তাই তিনি অত্যন্ত নম্রভাবে বলিলেন, "সত্যিকার ভালবাসা। যদি পুরুষ ও নারীর মধ্যে প্রকৃত ভালবাসা থাকে তবেই বিবাহ সম্ভব, নইলে নয়।"

বৃদ্ধের উজ্জ্বল চোখ তখনও ছল্ ছল্ করিতেছিল। তবুও একটু হাসিতে চেষ্টা করিয়া তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "বেশ কথা! কিন্তু এই সত্যিকার ভালবাসা দ্বারা আমরা কি বুঝি?"

মহিলা উত্তর দিলেন, "ভালবাসা যে কি, তা প্রত্যেকেই নিশ্চয় বোঝে, একি বুঝিয়ে দেবার জিনিষ?"

বৃদ্ধ বলিলেন "আমি ঠিক বুঝতে পারিনে, আপনি আমায় বুঝিয়ে দিন।"

মহিলা বলিলেন, "এ-ত খুব সোজা কথা।"

সোজা হইলেও তাঁকে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিতে হইল, তারপর তিনি বলিলেন, "সকলের চেয়ে একজনকে বেশী পছন্দ করাই হ'ল এই ভালবাসা।"

বৃদ্ধ এবার হাসিলেন, বলিলেন, "আচ্ছা, এই যে একজনকে বেশী পছন্দ করা—এটা ক'দিনের জন্য? একি এক মাস, না এক সপ্তাহ, না একদিন, না এক ঘণ্টার জন্য?"

মহিলা বলিলেন, "পরিষ্কার বুঝ্‌তে পারা যাচ্ছে আপনি আর কোন বিষয় বল্‌চেন।"

"না, না, আপনিও যা বল্‌চেন, আমিও ঠিক তা-ই বল্‌চি।"

এই সময় ব্যারিষ্টার তাঁকে বলিতে লাগিলেন, "মহিলা কি বল্‌চেন তা আমি স্পষ্ট করে আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ইনি বল্‌তে চান যে প্রথমতঃ পুরুষ ও নারী উভয়ের মধ্যেই ভালবাসা থাকা চাই, যদি প্রাণের টান থাকে তবেই বিবাহ পবিত্র হয়, নইলে হয় না; দ্বিতীয়তঃ যে বিবাহে ভালবাসা নেই, প্রাণের টান নেই, সেই বিবাহে নৈতিক বন্ধনও কিছুই নেই।"

তারপর মহিলার দিকে ফিরিয়া তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কথা ঠিক বলা হয়েচে ত?"

কোনও কথা না কহিয়া শুধু ঘাড় নাড়িয়াই মহিলা তাঁকে জানাইলেন যে ঠিকই বলা হইয়াছে।

"তার পর কথা এই যে,—"এই পর্য্যন্ত বলিতে না বলিতেই ব্যারিষ্টারকে থামিতে হইল। কারণ সেই বৃদ্ধ আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না, জলন্ত অঙ্গারের মত দুইটি লাল চোখে তাঁর দিকে চাহিয়া তাঁর কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "বুঝতে পেরেচি, আর বল্‌তে হবে না। আপনারা যা বলচেন আমিও ঠিক তাই বল্‌ছি। কিন্তু আমি জান্‌তে চাইচি, এই যে পূর্ব্বানুরাগ—এটা ক'দিনের জন্যে?"

অত্যন্ত বিরক্তির সহিত মহিলা জবাব দিলেন, "বহু দিনের জন্যে, কখনো কখনো সারা জীবনের জন্যে।"

"শুধু নাটক আর নভেলে এই অনুরাগ সারা জীবনের জন্য, কিন্তু বাস্তব জীবনে কখ্‌খনো তা দেখা যায় না। যা হ'য়ে থাকে তাতে এটা স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যায় যে, এই অনুরাগ সারাজীবন ত দূরের কথা, বহুদিনও প্রায়ই থাকে না। সচরাচর যা দেখা যাচ্ছে তাতে স্পষ্টই বুঝ্‌তে পারা যাচ্ছে, এই অনুরাগের আয়ু দু'চার মাস, দু চা'র সপ্তাহ বা দু'চার দিন, আবার কখনো কখনো বা দু'চার ঘণ্টা মাত্র।

তা নইলে, আজকাল এই পূর্ব্বানুরাগ যতই বেড়ে যাচ্ছে বিবাহ বিচ্ছেদ ততই বেশী হচ্ছে। বল্‌তে গেলে যত বিয়ে, প্রায় ততই ছাড়াছাড়ি।

বৃদ্ধের ঐই মন্তব্য শুনিয়া আমরা তিন জনেই সমস্বরে বলিয়া উঠিলাম, "সে কি মশায়? আপনি কি ক'রে এমন কথা বল্‌চেন? না, না, এ হতেই পারে না। আসল কথা হচ্ছে এই—"। এমন কি কেরাণীটিও বৃদ্ধের একথা মানিল না, সেও বিরক্তির ভাবই প্রকাশ করিল।

কিন্তু বুড়া আমাদের আর বলিতে না দিয়া নিজেই বলিলেন, "আপনারা একটা ভুল কচ্ছেন। আপনারা শুধু একটা অনুমান—শুধু একটা কল্পনা নিয়েই সব বলচেন, আর আমি বল্‌চি বাস্তব নিয়ে, অর্থাৎ যা আমাদের সমাজে হচ্ছে এবং হ'য়ে থাকে। এর কারণ হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক সুন্দরী যুবতীর প্রতিই প্রত্যেক পুরুষ একটু ভালবাসা অনুভব করে।"

মহিলা বলিলেন, "কি ভয়ানক কথা! আমরা যে ভালবাসার কথা বল্‌চি তা দু' এক মাস, দু'এক বছরের নয়, সারা জীবনের।"

"নিশ্চয়ই নয়। আচ্ছা যদি ধরেই নেয়া যায় যে, এক জন পুরুষ একজন নারীকে সব চেয়ে বেশী পছন্দ করে, আর সারা জীবনই তার এই অনুরাগ রয়েচে। সে ক্ষেত্রে এটাও খুব বেশী সম্ভব যে, সেই নারী পুরুষটিকে ভালবাসে না, হয়ত অন্য একজন পুরুষের দিকে তার টান বেশী। সারা দুনিয়ায় এই রকম ব্যাপারই চলেচে এবং চলবেও।"

এই বলিয়াই বৃদ্ধ একটি চুরুট বাহির করিয়া ধরাইয়া খুব জোরে টানিতে লাগিলেন। ব্যারিষ্টার বলিলেন "ভালবাসা উভয় পক্ষেরই সমান হ'তে পারে।"

"আজ্ঞে না, হ'তে পারে না। যা সাধারণত অসম্ভব, তা আমরা

মোটেই হিসেবের ভেতর নেই নে। একটা কথা হচ্ছে—পরিতৃপ্তি। একটা জিনিষে তৃপ্তি লাভ করলে, তার দিকে টান কমে। আপনি চিরকাল একজনকে সমান ভালবাসতে পারেন,—একথা বলতে যা, আর একটা বাতি সারাজীবনই জ্বলবে—একথা বলাও তা।"

বলিয়াই অসাধারণ উদ্যমে তিনি চুরুট টানিতে লাগিলেন।

মহিলা বলিলেন, আপনি অন্য রকমের ভালবাসার কথা বল্‌চেন। জীবনের একই আদর্শ, একই নীতি এবং একই রকমের ধর্ম্মপ্রবণতায় যে ভালবাসা জন্মায়, তা কি আপনি অস্বীকার করেন ?"

"ধর্ম্মভাব এবং জীবন্তের আদর্শের সমতা! তাই যদি হয়, তা হ'লেও ত একই শয্যায় একত্রে শয়ন কর্‌বার কোন কারণ থাকে না। আমার এই অশিষ্ট বাক্যের জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন আশা করি। আদর্শ এক বলেই একত্রে শয়নের ধারণা এবং ইচ্ছা লোকের মনে জন্মেচে!" বলিয়াই তিনি একগাল হাসিলেন।

ব্যারিষ্টার বলিলেন, "প্রকৃত ব্যাপার কিন্তু আপনি যা বল্‌চেন ঠিক তার উল্টো। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বিবাহ অনন্তকাল ধরেই চলে আসচে, যতদিন এই দুনিয়ায় মানুষ থাকবে ততদিন চল্‌বেও। পৃথিবীর সকল লোকেই অন্ততঃ বেশীর ভাগ লোকেই বিয়ে করে এবং অনেক লোক তাদের সুদীর্ঘ বিবাহিত জীবন খুব ভাল ভাবেই কাটায়।"

শুক্লকেশ বৃদ্ধ আবার একটু হাসিলেন, বলিলেন, "আপনারা বল্‌চেন যে ভালবাসার ওপরেই বিবাহ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যখনই আমি বল্‌তে চাই যে, বিবাহের মূলে সাধারণ ভালবাসার স্থানে আছে লালসা, এমনি আপনারা প্রমাণ করতে আরম্ভ কর্‌লেন যে, ভালবাসা আছে যেহেতু বিবাহ আছে। আজকালকার বিয়ে শুধু একটা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

ব্যারিষ্টার বলিলেন, "আমি যা কিছু বল্‌তে চাই তা হচ্ছে এই, বিবাহ আগেও ছিল, এখনও আছে এবং চিরকালই থাক্‌বে।"

"হ্যাঁ, বিবাহ ছিল—আছে—থাকবেও বটে। বিবাহ ছিল এবং আছে শুধু সেই সব জাতের মধ্যে যারা বিবাহটাকে শুধু একটা আইনের চুক্তি মনে করে না, যারা বিবাহকে মনে করে ধর্ম্মেরই একটা শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান, বিবাহের অনুষ্ঠানে যারা ভগবানেরই উপস্থিতি উপলব্ধি করে, এবং ভগবানকেই সাক্ষী রেখে বিবাহ ক'রে, যারা ছাড়াছাড়িকে মহা পাপ বলে মনে করে, বিবাহ বন্ধনকে যারা চিরকালের জন্য, অনন্ত কালের জন্য, জন্ম জন্মান্তর ধ'রে পবিত্র মনে করে। এই সব জাতের মধ্যে প্রকৃত বিবাহ আছে, আমাদের দেশে নেই। আমাদের দেশে বিবাহ শুধু একটা চুক্তি মাত্র, এর সঙ্গে ধর্ম্মের লেশমাত্র নেই, বিবাহের ভেতরে ভগবানের অস্তিত্ব আমরা প্রাণে প্রাণে অনুভব করি না। কাজেই এই ধর্ম্মশূন্য বিবাহের শেষ পরিণাম হচ্ছে প্রতারণা, ঝগড়া, মারামারি আর ছাড়াছাড়ি। অন্য কিছুর চেয়ে শুধু প্রতারণা, হ'লেও বরং খানিক সহ্য করা যায়। স্বামী প্রতারিত করে স্ত্রীকে, স্ত্রী প্রতারিত করে স্বামীকে। স্ত্রী মনে করে তার বিবহিত জীবন খুব ভালই চল্‌চে, সে তখনও হয়ত স্বামীর প্রতারণা বুঝতে পারে নি, আবার স্বামীও মনে ভেবে নিলে তার দাম্পত্য জীবন বেশ কাট্‌চে, স্ত্রীর প্রতারণা সে ধর্‌তে পারে নি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বামী অন্য কোন পল্লীর স্ত্রীলোককে দেখ্‌চেন, আর স্ত্রীও অন্য কোন পুরুষকে স্বামী ব'লে মনে কচ্ছেন। এটা কি নিতান্তই খারাপ নয়, অসহ্য নয়? স্বামী এবং স্ত্রীর একত্রে চিরকাল বাস করবার একটা বাধ্যবাধকতা আছে এজন্য তারা প্রতিশ্রুতও থাকে। কিন্তু ভগবানকে সাক্ষী ক'রে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েও, বিবাহের পর দু'চার মাসের মধ্যেই দেখা যায় স্বামী স্ত্রীকে ঘৃণা কচ্ছে, স্ত্রীও স্বামীকে ঘৃণা

কচ্ছে, এবং যদিও তারা ভেতরে ভেতরে ছাড়াছাড়ির জন্ম ছট্ ফট্ কচ্ছে—তবুও তারা একত্রেই ঘর কন্নাও কচ্ছে। শেষে তাদের জীবন নরকের মত বীভৎস হয়ে ওঠে। এরই ফলে কেউবা বিষ খেয়ে মরে কেউবা খুনো খুনি ক'রে মরে, কেউবা জলে ঝাঁপ দেয়। মোটকথা পরিণাম অত্যন্ত শোচনীয় হ'য়ে ওঠে।"

তিনি পূর্ণ উদ্যমে একটুও না থামিয়া এমনভাবে বলিতে লাগিলেন যে, আমরা কিছুই বলিবার সুযোগ পাইলাম না। বলিতে বলিতে তিনি নিজেই খুব উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, আমরা সকলেই চুপ করিয়া রহিলাম, আমাদের যে কিরকম একটা অশান্তি বোধ হইতেছিল। অশান্তি ও বিরক্তির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিবার ইচ্ছায়ই ব্যারিষ্টার বলিলেন, "এটা ঠিক যে, বিবাহিত জীবনে কখনো কখনো এরকম বিপদ-আপদ ঘটে থাকে।

এবার বৃদ্ধ খুব শান্ত ভাবে নরম সুরে ব্যারিষ্টারের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি জানেন কি আমি কে?"

ব্যারিষ্টার বলিলেন, "আজ্ঞে না, আপনাকে আমি চিনি না, চেনবার ইচ্ছাও আমার নেই।"

"আপনার ইচ্ছা না থাকতে পারে, কিন্তু এটা জানবেন যে, আপনার ইচ্ছাটাই একটা বড় জিনিষ নয়। কাজেই ইচ্ছা আপনার থাক আর নাই থাক্, আমি আমার পরিচয় দিচ্ছি। আমার নাম পজ্ নিশেফ্। বিবাহিত জীবন যে বিশেষ মারাত্মক বিপদের কথা বললেন, আমি তার ভুক্তভোগী। আমার সেই বিপদ যে-সে ব্যাপার নয়—হত্যা! আমিই আমার স্ত্রীকে খুন করে ফেলেছিলুম।

বলিয়াই তিনি একে একে আমাদের সকলের দিকেই তাকাইলেন।

আমরা ত শুনিয়াই একেবারে থ' হইয়া গিয়াছিলাম। আমাদের আর কথা কহিবার মত শক্তি যেন ছিল না, সকলেই একেবারে চুপ।

কিন্তু আমরা চুপ করিয়া থাকিলেও তিনি চুপ করিলেন না। বলিলেন, "যাই হোক্ আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চাই, আপনাদের এতকাছে থেকে আর বেশীক্ষণ জ্বালাতন কর্‌ব না।"

ব্যারিষ্টার বলিলেন, "না, না, আমরা মোটেই কোন অসুবিধে বোধ কচ্ছি নে; অমন কথা বল্‌বেন না।"

পজ্‌নিশেফ্‌ তাঁর কথায় মন না দিয়া ফিরিয়া নিজের জায়গায় গিয়া বসিয়া পড়িলেন।

আমরা তখনও চুপ করিয়াই ছিলাম। কেবল ব্যারিষ্টার এবং সেই মহিলা চুপি চুপি কথা কহিতে লাগিলেন।

৩

এই বৃদ্ধ পজ্‌নিশেফ্‌ যে বেঞ্চিতে বসিয়াছিলেন তার সামনের বেঞ্চিতে একটু দূরে আমি চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম। আমার বলিবার কিছুই ছিল না, আর একটু অন্ধকার হইয়াছিল বলিয়া কিছু পড়িবারও সুবিধা ছিল না। কাজেই আমি লম্বা হইয়া শুইয়া চোখ বুজিয়া রহিলাম; চোখে আমার ঘুম ছিল না, তবুও ঘুমের ভাণ করিয়াই নিশ্চল হইয়া পড়িয়া রহিলাম।

গাড়ী পরের ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। মহিলা এবং ব্যারিষ্টার ভদ্রলোকটি প্লাটফরমে নামিয়া আর একটা গাড়ীতে উঠিলেন। কতক লোক নামিয়া যাওয়ায় একটু বেশী জায়গা খালি পাইয়া সেই কেরাণীটিও লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ঘুমে অজ্ঞান হইয়া

গেল। এতক্ষণ ধরিয়া বুড়া ভদ্রলোকটি চুরুট টানিতে ছিলেন, আর পূর্ব্বের ষ্টেশনে নামিয়া যে জল লইয়া আসিয়াছিলেন সেই জলে চা তৈয়ারী করিয়া খাইতেছিলেন।

যেমন একটিবার চোখ খুলিয়াছি বৃদ্ধ অমনি আমার দিকে তাকাইলেন। তারপরে খুব গম্ভীর স্বরে তিনি আমায় বলিলেন, "আমি কে এবং কি রকমের লোক তাত আপনি জান্‌তে পেরেচেন, কাজেই আমার কাছে বসাটাও আপনার খুবই খারাপ ব'লে মনে হচ্ছে, নয়? যদি তাই মনে করেন আমি চলেই যাচ্ছি। আর এক গাড়ীতেই বরং যাব।"

আমি অমনি বলিলাম, "না, না, কিছুই মনে করিনি। আপনি অমন কথাটি বল্‌বেন না।"

বোধ হয় বৃদ্ধ আমার উপরে একটু খুসী হইলেন, বলিলেন, "আপনাকে একটু চা দেব? খান না একটু। বোধ হয় একটু কড়া হয়ে গেচে।"

তিনিত খানিকটা চা আমাকে ঢালিয়া দিলেন। কি কড়া চা! কড়া হইলেও না খাইয়া পারিলাম না।

তিনি বলিলেন, "দেখুন ওঁরা যা বলেন সবই বাজে, সবই ভুঁয়ো।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কিসের কথা বলচেন?"

"এই যে কথা হচ্ছিল। বিয়ের কথা আর ভালবাসার কথা। আপনার কি ঘুম পাচ্ছে?"

যে চা খাইয়াছি তাতে, যদিও কখনো একটু ঘুম হইত, সে আশাও আমার আর ছিল না। তাই আমি বলিলাম, "না, না, আমার ঘুম মোটেই পায়নি।

"আমি যে বীভৎস কাজ করেচি তার মূলেও ছিল ঐ ওঁরা যে

'ভালবাসা'র কথা বলছিলেন তাই। আঁপনি শুনতে চান ত আমি বলতে পারি।"

আমি বলিলাম, "যদি বলতে আপনার কষ্ট না হয় আমি নিশ্চয়ই শুনব।"

"না আমার কষ্ট হবে না, বরং ব'লে মনটা খোলসা না করলেই আমার কষ্ট হবে। শোনবার আগে আর একটু চা খেয়ে নিন। চাটা বড্ড কড়া হয়ে গেছে।"

কি সর্ব্বনাশ! ঐ চা আবার খাইতে হইবে! কিছু বলিলাম না। 'মৌনং সম্মতি লক্ষণম্' মনে করিয়া বৃদ্ধ খানিকটা চা দিলেন। এবারে চা একেবারে ভীষণ রকমের কড়া হইয়া গিয়াছিল। তবুও খাইলাম, কিন্তু চা খাইলাম কি মদ খাইলাম বুঝিতে পারিলাম না, এমনি তার রং।

যেমনি বৃদ্ধ গল্পটি আরম্ভ করিবার উপক্রম করলেন অমনি এক রেল কর্ম্মচারী আমাদের কামরায় ঢুকিলেন। বৃদ্ধ নিতান্ত বিরক্ত হইয়া খানিকক্ষণ মুখ ভার করিয়া রহিলেন। কর্ম্মচারীটি নামিয়া যাওয়ার পর তিনি বলিলেন, "এইবার আমি বলব। আপনি কি সত্যি শুনবেন?"

আমি তাকে বলিলাম যে সত্যই গল্পটি শুনিবার ইচ্ছা আমার হইয়াছে।

একটুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া, দুই হাত দিয়া কপাল এবং মুখখানা মুছিয়া তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন:—

"বিবাহের পূর্ব্বে আমিও অন্য দশ জনের মতই ছিলুম। সমাজে আমার খুব প্রতিপত্তি ছিল, থাকবারও কথা; কারণ আমি ছিলুম বড়লোক—জমিদার, তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও আমি সংশ্লিষ্ট ছিলুম। দেশের সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেও আমি একজন উচ্চপদস্থ

লোক ছিলুম। বিবাহের আগে অবধি যে ভাবে জীবন কাটিয়ে এসেচি তাতে মনে হয়েছিল যে আমার কর্ত্তব্যের পথে আমি ঠিকই চলেচি। নিজেকে আমি নৈতিক চরিত্রের আদর্শ ব'লেই মনে করতুম। আমার বয়সের এবং আমার সমান পদস্থ লোকদের মত কেবল আমোদ-প্রমোদই আমি জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিনি। আমি কখনো কোন স্ত্রীলোকের মনভুলাবার চেষ্টা করিনি, আমার নিতান্ত ঘৃণিত প্রবৃত্তি ছিল না। তবে যেটুকু নৈতিক অপরাধ করতুম তাও খুব সামান্য, আর তা কর্‌তুম ডাক্তারের পরামর্শে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য। স্ত্রীলোকের সংসর্গ এড়িয়েই চল্‌তুম। আমার ধারণা ছিল এই যে, যদি তাদের ভালবাসায় জড়িয়ে পড়ি তা হ'লেই ত ফ্যাসাদ। ভালবাসার টান যে আমার অন্তরে ছিল না তা নয়, কিন্তু বাইরে দেখাতুম যেন আমার ওসব কিছুই নেই। আমি খুব গর্ব্ব অনুভব করতুম, কারণ এইটিই আমি নৈতিক চরিত্রের আদর্শ ব'লে মনে স্থির ক'রে রেখেছিলুম!"

তিনি হঠাৎ থামিয়া গেলেন। খানিকক্ষণ কাসিয়া চুরুটটায় কয়েকটা টান দিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "এতেই আমার চরিত্র খারাপ হ'তে লাগ্‌ল। কথা হচ্ছে এই, যখন ভালবাসা বা পরিচয় খুব বেশী হয়ে পড়ে তখনই সমস্ত নৈতিক বন্ধন থেকে যে নিজেদের আমরা মুক্ত করি এইটিই হ'ল ভুল। অন্যায় ও অসদাচরণের যে সঙ্কোচে বা বাধা থাকে, পরস্পরের ক্রমাগত মেলামেশায় তা শিথিল হ'য়ে পড়ে। শিথিল হতে দিয়েই আমরা ভুল করি আমিও এই বাধা বা সঙ্কোচ ক্রমাগত দূর করে দিচ্ছিলুম, আমি এইটিকেই একটা গুণ মনে করতুম। একবার এক যুবতী খুব সম্ভব আমাকে ভালবেসেছিল। আমি তাকে টাকা পাঠাতে পারিনি বলে আমার ভয়ানক দুঃখ হয়েছিল। তার সঙ্গে যেরকম ক'রে মিশেচি তা যে ভাল তা একেবারেই নয়।

যতদিন টাকা পাঠাতে পারিনি ততদিন আমার মানসিক যন্ত্রণা একটুও কমেনি। টাকা পেয়ে সে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল যে, নৈতিক বন্ধনের কঠোরতা আমার আর কিছু মাত্র নেই।"

আমি তাঁর কথা শুনিতেছিলাম আর ঘাড় নাড়িয়া সায় দিতেছিলাম।

তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "না, না, ওরকম ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে আমাকে খুসী করবার কোনই দরকার নেই। ও শুধু একটা চালাকি, ও আমিও বেশ জানি। মাপ করবেন মশায়। কথা হচ্ছে যে ব্যাপার বড়ই ভয়ানক।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি ব্যাপার ?"

"নারীর সঙ্গে পুরুষের যে সম্বন্ধ তা নিয়ে আমরা এমন একটা প্রতারণা কচ্ছি, এমন একটা ভুল ধারণা নিয়ে রয়েছি তা মারাত্মক। হ্যাঁ, আমার একটা মস্তদোষ এখন এই হয়েচে যে, ধীরে সুস্থে কোন কথা বলতে পারিনে, আমি যেন উত্তেজিত হ'য়ে পড়ি। যে বিষম ঘটনা আমার জীবনে ঘটেচে সেজন্য যে এরকম হচ্ছে তা নয়, তবে সেই ঘটনা হওয়ার পর থেকেই আমার সমস্ত মত একেবারে বদ্‌লে গেচে। আমি যেন এখন একেবারে আলাদা মানুষ। আমার চোখ খুলে গেচে। একবার বিষম ভুল ক'রে যথেষ্ট শিখেচি। আমার ভেতরটা বদ্‌লে একেবারে উল্টো হ'য়ে গেছে—একেবারে উল্টো।"

তিনি একটি চুরুট ধরাইলেন। তখন অন্ধকার ছিল, কাজেই তাঁর মুখখানা আমি ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু দেখিতে না পাইলেও তাঁর গলা ঠিক শুনিতে পাইলাম। ট্রেণের ঘড়্ ঘড়্ শব্দও ছাপাইয়া তাঁর কথা আমার কাণে আসিতেছিল।

তারপর তিনি বলিলেন, "ঠেকে শিখেচি মশায়। যন্ত্রণায় আমার হৃদয়ের তন্ত্রীগুলো সব যেন মুচ্‌ড়ে ছিঁড়ে গিয়েছিল। ঘা খেয়ে ভেবেচিন্তে বুঝ্‌তে পেরেচি রোগের মূল কোথায়। সেই সময় থেকেই জান্‌তে পেরেচি কি হওয়া উচিত, এবং যা হচ্ছে তার গলদ কি এবং কোথায়।

"যাক্‌, আমার জীবনে যে বিষম কাণ্ড ঘটেচে তা তার উৎপত্তি কোথাথেকে কি করে হ'ল, তা এবার আপনাকে বল্‌চি। আমার বয়েস ষোল বছরও পূর্ণ হতে না হতেই আমি কুপথে পা দিয়েচি। তখনও আমি ছাত্র মাত্র, আমার দাদাও তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার্থী। পূর্ব্বে আমি কখনো কোন স্ত্রীলোকের খবর রাখিনি, কিন্তু তাই বলে যে নির্দ্দোষ ছিলুম তা নয়। আমার বন্ধুরা, সহচরেরাই আমার মন কলুষিত ক'রে দিয়েছিল। তার ফলে হ'ল এই যে, কোন এক বিশিষ্ট স্ত্রীলোকের বিষয় না হলেও স্ত্রীলোকের চিন্তায় আমার মনটা কিরকম ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ত।

"যখন একলা থাকতুম তখন কতরকমের কুৎসিৎ চিন্তা আমার মাথায় ঢুক্‌ত। কাজেই শতকরা নিরেনব্বুইজন যুবকেরই মত আমি মনে মনে একটা বিষম কষ্ট অনুভব করতুম। মন এক এক সময়ে আঁৎকে উঠ্‌ত, ভয়ানক ভয় হ'ত, ভগবানের কাছে এক একবার প্রার্থনাও করতুম! কিন্তু এতবড় প্রলোভন দমন করতে পারতুম না, আবার সেই কুচিন্তা এসে মনটা ঢেকে ফেল্‌ত। কাজেই চিন্তায়—কল্পনায় আমি অত্যন্ত কলুষিত হয়েছিলুম। আমি নিজেই নষ্ট হচ্ছিলুম, আর কাউকে জড়িয়ে তখনও নষ্ট করিনি।

"এই সময়ে আমার দাদার এক বন্ধু এল। ইনিও বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র। লোকে তাকে খুব ভাল ছেলে বল্‌ত, প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন অতি অপদার্থ, অতি জঘন্য। বাইরে সে বেশ ভাল মতই থাকৃত, হাসিগল্প খুব করত, পাঁচজনের সঙ্গে বেশমিশ্‌তেও পারত। দাদার বন্ধু, কাজেই সে আমারও বন্ধু। এই বন্ধুবর আমাদের মদ খেতে শেখালে। একদিন মদ খাওয়ার পর নিতান্ত এক কুৎসিৎ স্থানে যাওয়ার জন্য সে আমাদের ধ'রে বস্‌ল। সে কতরকম যুক্তি দিয়ে আমাদের বোঝাতে লাগ্‌ল। আমরা তার সঙ্গে গেলুম। আমার ভাই, এর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অনেকটা নির্দ্দোষ ছিল, তারও সেই দিনই পতন হ'ল। আর ষোল বছরের বালক আমিও সেই দিন থেকেই উৎসন্নের পথে ভয়ানক এগিয়ে যেতে লাগ্‌লুম। তখন বুঝতেই পার্‌লুম না কি ভীষণ অন্যায় কাজ কচ্ছি, কি ক'রে আর পরিণাম চিন্তা করব?

"যারা আমার বয়োজ্যেষ্ঠ তারা কখনো আমায় বলে নি যে আমি অন্যায় কচ্ছি, যে পথে চলেচি সে হচ্ছে পাপের পথ, প্রকৃত মৃত্যুর পথ এমন কি আজকালও বড়রা ছোটদের সাবধান করে দেয় না। সত্যি বটে সদুপদেশের বইও আছে, স্কুলে কলেজে তা পড়তেও হয়, কিন্তু সে কেবল পরীক্ষায় কয়েকটি নম্বর পাওয়ার জন্যে ছেলেরা মুখস্থ ক'রে রাখে। প্রায়ই আবার মুখস্থ না করলেও চলে, কারণ বিদ্যালয়ে এসব পুস্তকের চেয়ে ব্যাকরণের সূত্র, ভূগোলের সংজ্ঞা প্রভৃতির ওপরেই জোর দেয়া হয় বেশী। নীতিশিক্ষা ধর্ম্মশিক্ষাত বিদ্যালয়ে হয়ই না, চরিত্র গঠনও হয় না। যাই হোক, যাঁদের কথা বিশ্বাস করি, যাঁদের শ্রদ্ধা করি তাঁরা কেউই আমায় বারণ করেন নি। বারণ করাও দূরের কথা তাঁরা বরং বলেচেন আমি ঠিকই কচ্ছি।

"তা ছাড়া আমি যাদের ভাল বলে জানতুম তাদেরও ঐ রকম

অন্যায় করতে দেখে ভাবতুম, আমি যা অন্যায় বলে মনে কচ্ছি তা বোধহয় মোটেই অন্যায় নয়, তার পরিণাম নিশ্চয়ই খারাপ নয়, এতে ভয়ের কোন কারণ নেই ; আমারই বোধহয় ভুল, আর এই বৃথা সংশয়। গভর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করে, মোটা মাইনের সব ডাক্তার নিযুক্ত ক'রে বারবণিতাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে। স্বাস্থ্যের পক্ষে কোনটা নিতান্ত দরকার তা এই ডাক্তাররাই ঠিক ক'রে দেয়, এবং ডাক্তাররাই এই রকম চরিত্র সমর্থন করে। এ জন্যে বিজ্ঞানই দায়ী।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বিজ্ঞান দায়ী হবে কেন মশায় ?

"ডাক্তাররা বিজ্ঞানের এক একটা বড় পাণ্ডা। প্রথমে তারা অসৎপথে যেতে সাহায্য করে, তারপর যখন ব্যারাম হয়, তখন তারাই আসে চিকিৎসা করতে। কি আশ্চর্য্য।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যারামের চিকিৎসা করবে না কেন ?"

এক্ষেত্রে চিকিৎসা করার অর্থ হচ্ছে গোড়া কেটে আগায় জলদেয়া। যে কারণে ব্যাধি জন্মায় সেটি বন্ধ করবার জন্য যদি তারা এতটুকুও চেষ্টা করত তা হ'লে যে আজ এসব ব্যারাম লোকের মোটেই হত না। যেটা সর্ব্বনাশের মূল সেটা দূর না ক'রে তারা বজায়ই রাখে, মানুষকে কুপথে যেতে সাহায্যই করে। যাক্, এসব নিয়ে আলোচনা করবার এখন আর আমার দরকার নেই। আমার নিজের যা হয়েছিল তা-ই আমি বলে যাই কিন্তু এটা বেশ জান্‌বেন যে, আমার যা হ'য়েছিল, তা অন্ততঃ প্রত্যেক দশজনের মধ্যে নয় জনের হয়ে থাকে। আমার এই অধঃপতন ভালবাসায় হয় নি। প্রকৃত ভালবাসায় এ সর্ব্বনাশ হয় না। এ কিছুতেই ভালবাসা নয়। আমার পতনের কারণ হ'ল এই যে আমি যে সংসর্গে থাক্‌তুম সেই সংসর্গই আমার কাজকে খুব স্বাভাবিক সরল এবং নির্দ্দোষ বলে সমর্থন করেচে। দরকার এবং আমোদ মনে

করে আমার তরুণ হৃদয় সেই কুপথেই চল্‌তে লাগ্‌ল। তা ছাড়া এটাও শোন্‌তে পেতুম যে আমার মত যুবকদের পক্ষে চুরুট খাওয়া, এমন কি মদ খাওয়াটাও বিশেষ দরকারই শুধু নয়, একটা বিশেষ কর্ত্তব্যও বটে। একথা ডাক্তাররা বেশ করে বুঝিয়ে দিয়েচে। চারদিকের সহায়তায় আমি খুব প্রবল বেগেই পাপের পথ এগিয়ে যেতে লাগ্‌লুম। আমার স্পষ্ট মনে আছে যে প্রথমদিন পাপ করবার পর আমি দুঃখে, মানসিক যন্ত্রণায় একেবার অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম।

"তারপর থেকে আমার অন্তরের সরলতা এবং পবিত্রতা যা কিছু ছিল সবই গেল, কাজেই আমি আর কোন নারীর দিকে সরল সহজ নির্দ্দোষ চোখে তাকাতে পারলুম না। পারব কি ক'রে? আমার মন তখন কলুষিত, বিষাক্ত। আফিং খোর কিংবা মাতালকে যেমন তার চোখ মুখ দেখে, তার হাব ভাব দেখে চেনা যায়, কেউ নজর করে দেখ্‌লে আমারও ভেতরের পাপ সে দেখ্‌তে পেত। চরিত্রহীনতা কিছুদিন চেপে রাখা যায় বটে, বাইরে সাধুতা দেখান হয়ত সম্ভব হতে পারে, কিন্তু এটা ঠিক যে এ ভণ্ডামিদ্বারা মনকে ফাঁকি দিতে পারা যায় না। মনে যখন পাপ ঢোকে তখন আর মানুষ নারীকে, মা বা ভগ্নী মনে ক'রে তার সঙ্গে মিশতে পারে না। ভ্রাতা ও ভগিণীর পবিত্রভাব অন্য নারীর সঙ্গে সে আর রক্ষা করতে পারে না। আমিও পারি নি। তাই আমিও হয়ে পড়লুম নিতান্ত চরিত্রহীন, নিতান্ত লম্পট। আমার সর্ব্বনাশ হ'ল।"

একটু থামিয়া আবার তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমি এর পর থেকে অধঃপতনের নিম্নতম স্তরের দিকে ক্রমাগত নেমে যেতে লাগলুম। ভাল হওয়ার কোন চেষ্টা করতে গেলেই বন্ধুরা আমায় বিদ্রূপ বাণে বিদ্ধ করত। সেনাবিভাগের অনেক বড় বড় কর্ম্মচারী, বহু উচ্চ শিক্ষিত যুবকের কীর্ত্তির কথা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, মশায় একেবারে অবাক হবেন। যাই হোক্, এমনি করেত আমার দিন যেতে লাগল। এই ভীষণ দুর্নীতি, এই চরিত্রহীনতার ভেতর দিয়ে বড় হয়ে আমার বয়েস হ'ল তিরিশ। মজা এই এত ভীষণ দূষিত অন্তর নিয়েও আমরা ভাল ভাল কাপড় চোপড় পরে সেজেগুজে, পোষাকে আতর ছড়িয়ে ফিট ফাট হয়ে একেবারে দস্তুর মত ভদ্রলোক হ'য়ে কত মজলিসে, কত নাচ ঘরেই না গেছি। ভেতরের পঙ্কিল আত্মাকে সাদা ধব্ ধবে কাপড় চোপড় দিয়ে ঢেকে লোককে ফাঁকি দিতেম।

"সত্যি যে ব্যাপার চলেচে তার সঙ্গে যা হওয়া উচিত তার একবার তুলনা ক'রে দেখুন দেখি। যা হওয়া উচিত বলে মনে করি তা আপনাকে বলচি শুনুন। ন্যাকামি—ভাণ্ডামির চেয়ে সোজা কথা ঢের ভাল, তা প্রিয়ই হোক্ আর অপ্রিয়ই হোক্। যা গর্হিত বলে মনে হবে, তা যেই করুক না কেন তাকে স্পষ্ট সেটি ব'লে দিয়ে বিদায় করতে হবে। আমিত এই বুঝি। ধরুন আমার মত চরিত্রহীন কোন যুবক যদি আমার বাড়ীতে আসে, আমার বোন বা মেয়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়, মেলামেশা করে, তা হলে আমার কি করা উচিত?

আমার উচিত হচ্ছে তার কাছে গিয়ে তাকে চুপ করে ডেকে নিয়ে বলা, 'ভাই, তুমি যে চরিত্রের লোক তা আমি জানি। তুমি কার সঙ্গে কি রকমে সময় কাটাও তাও আমার অজানা নেই, এটা তোমার যোগ্য স্থান নয়। আমার ভগ্নী, কন্যা পবিত্র চরিত্র। এখান থেকে স'রে পড় বিদেয় হও শীগ্‌গীর।' এমনি ক'রে স্পষ্ট বলে দেওয়া উচিত। তাত কেউ বলেনা, কাজেই, মানুষ ভাল হয় কোত্থেকে? লোকে যা করে তা হচ্ছে এই—যদি এই রকম লোক বাড়ীতে আসে আর সে যদি খুব ধনী হয়, তাকে অত্যন্ত আদর আপ্যায়িত করা হয়, ভগ্নী বা কন্যার সঙ্গে যাতে সে মেলামেশা করে তারই চেষ্টা করা হয়। মেয়েদের সঙ্গে তাকে বেড়াতে দেখা হয়, ঘনিষ্ঠতার সুযোগ দেওয়া হয়। কি লজ্জার কথা! ছিঃ ছিঃ কি ঘেন্নার কথা। সে দিন কবে আসবে যে দিন মানব সমাজ থেকে এই বীভৎস নির্লজ্জতা, এই ঘৃণিত দুর্নীতি একেবারে লোপ পাবে?"

এই বলিয়াই তিনি কয়েকবার আসিয়া একটু এদিক ওদিক পায়চারি করিলেন এবং চা ঢালিয়া খানিকটা খাইলেন। চায়ের রংটা তখন একেবারে কালো হইয়া গিয়াছে, এত ভয়ানক কড়া! তাঁর কাছে একটু জলও ছিল না যে খানিকটা মিশাইয়া চা পাৎলা করিয়া লইবেন। আমি দুইবার যে চা খাইয়াছিলাম তাতেই আমার সমস্তটি শরীর একেবারে গরম হইয়াই ছিল, ঘুমত একেবারেই চলিয়া গিয়াছিল। মোট কথা ওরকম কড়া চা জন্মে কখনো খাই নাই। তিনিও যে এতটা উত্তেজিত হইয়াছিলেন তার মূলেও যে এই চায়ের খানিকটা গুণ নাই তা নয়। তিনি যতই চা খাইতে লাগিলেন ততই বেশী উত্তেজিত হইতে লাগিলেন, আর তাঁর গলাও ততই গম্ গম্ করিতে লাগিল।

তিনি যেন একটু ছট্ ফট্ করিতেছিলেন। কখন বা টুপীটা মাথায় দিলেন, আবার খুলিয়া ফেলিলেন। তাঁর মুখের চেহারাটা যে অদ্ভুত রকম বদ্‌লাইয়া গিয়াছিল, তা অন্ধকারেও বেশ বুঝিতে পারা গেল।

তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন, "তিরিশ বছর বয়েস্ অবধি এমনি ভাবেই জীবন কাটালুম। কিন্তু এত অধঃপতনের মধ্যেও বিয়ে করার ইচ্ছাটা আমি একেবারেই ত্যাগ করিনি। এই ইচ্ছাটি আমার বরাবরই ছিল। মনে করেছিলুম বিয়ে করে ভাল হ'য়ে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে মহাসুখে দিন কাটাব। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মনের মত একটি যুবতীর সন্ধান করতে লাগ্‌লুম।

"ভাবলুম আমার স্ত্রী হওয়াত সোজা কথা নয়। তার তেমনি গুণ থাকতে চাই। আমি যা-ই হইনা কেন তার চরিত্রটি একেবারে নিখুঁত হওয়া চাই-ই। অনেক দেখে বেড়ালুম, কাউকেই পছন্দ হ'ল না। শেষে একজনকে পছন্দ হ'ল। ভাবলুম আমার স্ত্রী হওয়ার গৌরব একে দেয়া যেতে পারে।

"সে ছিল এক জমিদারের মেয়ে। জমিদার প্রথম জীবনে খুব ধনীই ছিলেন বটে, তবে শেষটায় তাঁর আর বিশেষ কিছু ছিলনা। একদিন সন্ধ্যার সময়ে তার সঙ্গে নৌকায় ক'রে বেড়ালুম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাত্তির হ'ল। চাঁদের আলোয় তখন সমস্তটা দুনিয়া মহাসুখে স্নান কচ্ছে। আমরা তখন ফিরে আস্‌ছিলুম। সুস্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে ঝল্‌মল্ করা পোষাকপরা তার সুগঠিত দেহ, উজ্জ্বল মুখ, আর তার সেই কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ দেখে আমিত মুগ্ধ হ'য়ে গেলুম। ভাবলুম এই রমণীই আমার স্ত্রী হওয়ার যোগ্যা। তাকে বিয়ে করাই তখন মনে মনে স্থির করে ফেল্‌লুম। মনে হ'ল সেও আমার মনের কথা নিশ্চয়ই

বুঝ্‌তে পেরেচে। হঠাৎ আমি তাকে সব চাইতে বেশী পছন্দ করলুম্ কেন? তার কোঁকড়ান চুল তার পোষাক-পরিচ্ছদ, তার চেহারা, এক কথায় তার বাইরের চমক দেখেই আমি আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলুম, তাই চেয়েছিলুম তাকে আমার নিকটতম করতে।

"হায়রে এই বাইরের চমক্! ভেতরের সৌন্দর্য্য আমরা কেউ দেখি কি? দেখ্‌বেন সুন্দর মুখেরই সর্ব্বত্র জয়। সুন্দরী যুবতী বাজে যা তা বলে গেলেও আমরা তার ভেতরে জ্ঞান অন্বেষণ করি। তার মুখের কর্কশ খারাপ কথাও আমাদের কাণে অমৃত ঢেলে দেয়। যদি তেমন দোষের কিছু নজরে না পড়ে তা হ'লেই আমরা তাকে চরিত্রে ও জ্ঞানে আদর্শ ব'লে মনে করি! আমিত আনন্দে ডগমগ হ'য়ে বাড়ী ফিরলুম এবং সময় নষ্ট করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় মনে করে পর দিনই তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করলুম।

"হাজারের ভিতরে কটা লোক পাওয়া যায় যে বিবাহের পূর্ব্বে বহুবার বিবাহ করেনি? খুব কমই পাওয়া যায়, এমন কি একজন পাওয়াও ভার। চিত্তশুদ্ধি সোজা কথা নয়, কিন্তু সোজা না হলেও খুবই দরকারী জিনিষ। শোন্‌তে পাচ্ছি আজকালকার অনেক যুবকই এটা বোঝেন এবং অনুভবও করেন। খুবই ভাল কথা। কিন্তু আমাদের সময়ে অন্ততঃ হাজারে একজনও পাওয়া যেত না।

"উপন্যাসে আর নাটকে দেখা যায় যে নায়ক কোন এক গুণবতী রূপবতী যুবতীর জন্য একেবারে উন্মাদ হয়ে গিয়েচে কিন্তু এই একটির জন্য উতলা হওয়ার পূর্ব্বে আর কারু জন্যে সে উতলা হয়েছিল কিনা, মন তার কলুষিত হয়েছিল কিনা, অন্ততঃ কল্পনাও হয়েছিল কিনা তা উপন্যাস বর্ণনা করে না, নাটক তা দেখায় না। মেয়েদের কাছে যারা বিয়ের প্রস্তাব করে তারা নিজেদের কাহিনী ব্যক্ত করে না, খুব সৎ

খুব মহৎ ব'লে নিজেদের জাহির ক'রে মেয়েদের তারা প্রবঞ্চিত করে। মেয়েরা তাদের কথা সত্যি বলে মনে করে। যদি পুরুষের জীবনের গুপ্ত অধ্যায় তারা জানতে পায় তা হলে কি তারা এত সহজে আত্ম-সমর্পণ করে, এত দুর্ভোগ ভোগে, এত যন্ত্রণা পায়? ভণ্ডামি করে আমরা ভণ্ডামিতে অভ্যস্ত হয়ে গেচি। কিন্তু মেয়েরা খুবই সরল মনে আমাদের কথা বিশ্বাস করে। আমার স্ত্রীও আমার কথায় বিশ্বাস করেছিল। এই ভণ্ডামি, এই প্রবঞ্চনা নিয়ে জীবন যাপন করেও আমরা মনে করি আমাদের চরিত্র ভালই আছে; এইটিই আশ্চর্য্য।

"বিবাহের পূর্ব্বে আমি আমার স্ত্রীকে আমার ডাইরিটা একবার দেখালুম। আমার জীবনের অনেক গুপ্ত কথা পাছে সে অন্যের কাছে জানতে পারে এ আশঙ্কাও আমার ছিল। আমার স্পষ্ট মনে আছে যে, ডাইরি থেকে মাত্র দু' একটা ঘটনা জেনেই তার কি ভীষণ ভয় হয়েছিল, নৈরাশ্য তাকে কতকখানি অভিভূত ক'রে দিয়েছিল। ভয় ও ভীষণ মানসিক যন্ত্রণা তার মুখখানায় যে রকম ফুটে উঠেছিল আজ তা আমার চোখের সামনে ভাসচে। সে আমার পূর্ব্ব জীবনের একটু আভাস পেলে, আর জানতে পারলে যে আরও অনেক যুবতীর সঙ্গে আমার প্রেমের আদান প্রদান চলেছিল। সে তৎক্ষণাৎ আমার সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন ক'রে চ'লে যেতে চাইলে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তিনি গেলেন না কেন? কে তাঁকে বাধা দিয়েছিল?"

আমার এ কথার কোন উত্তর না দিয়া বৃদ্ধ কয়েকবার কাসিয়া চা ঢালিতে লাগিলেন। তারপর চা খাইতে খাইতে বলিলেন, "হ্যাঁ তার পক্ষে তখনই চলে যাওয়া ভাল ছিল। পাপের ভোগ আমার যথেষ্টই হয়েচে—"

তিনি বলিলেন, "যাক্ সে কথা। আমি যা বল্‌তে চাই তা হচ্ছে এই যে, পুরুষ ও নারীর মধ্যে নারীই সকল রকমে প্রবঞ্চিত হয়। নারীকে খারাপ করে পুরুষ। মায়েরা সবই জানেন সবই বুঝ্‌তে পারেন, তাঁদের স্বামীদের দ্বারা কলুষিত হ'য়ে পুরুষ চরিত্র কতটা দূষিত তা তাঁদের জানতে বাকী নেই; কিন্তু তাঁরা তাদের মেয়েদের সাবধান করে দেন না, বরং কোন্ কোন্ টোপ ফেল্‌লে বর ধর্‌তে সুবিধা হয় তাই শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

"আমাদের এই 'ভালবাসা' সম্বন্ধে যে সব খুব বড় বড় উঁচু উঁচু বচন ঝাড়া হয় সে গুলোর কোন সুদৃঢ় নৈতিক ভিত্তি নেই, তার ভিত্তি হচ্ছে ক্রমাগত দেখা-সাক্ষাৎ, কাপড় চোপড়ের জাঁক-জমক, চুলের কায়দা আর মুখের রং-ঢং। এইটি তাদের বেশ ভাল রকম জানা আছে। অবশ্যি এর যে কোন ব্যতিক্রম হয় না তা নয়।

"আমরা খারাপ করি বলেই মেয়েরা খারাপ হয়, এবং তারা খারাপ হয় বলেই পুরুষকে ভোলাবার চেষ্টা করে, ঠকাতে চায়। বাইরের চটক দেখে আমরা ভুলি বলেই তারা নানা রকম কায়দা করে। তাদের হাব-ভাব দেখে আমরা একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে পড়ি। উচ্চ শ্রেণীর ঘরের মেয়েদের জীবন সব চেয়ে বেশী দূষিত।"

আমি বলিলাম, "আমি একথা স্বীকার করতে পাচ্ছিনে, মাপ করবেন।"

আমার কথায় বাধা দিয়া তিনি বলিলেন, "আপনি বিশ্বাস করেন না? আমি আপনাকে প্রমাণ করে দেখাব। আমার এই উচ্চ

সমাজের মেয়েরা যদি ভালই হবে তবে তাদের চাল-চলন, ব্যবহার সবই ত ভাল হওয়া উচিত।—তা কই? ঘরে যে ভাল, সে বাইরে খারাপ হবে কেন? মোট কথা দুর্নীতি তাদের একটুও কম নয়।

"যাক্, আমার নিজের কথা এখন আমি বল্‌চি। আমিও ঝক্‌ঝকে পোষাকে, কোঁকড়ান চুলে, মিষ্টি গলায়, একেবারে মোহিত হ'য়ে গেলুম। যে আবহাওয়ায় আমি বেড়ে উঠেছিলুম তাতে আমাকে ভোলানো কিছুই শক্ত ছিল না। একে আমার ছিল অতি দূষিত মন, তার ওপরে ছিল অতিরিক্ত উত্তেজক খাদ্য খাওয়া, আর পরিশ্রমের সম্পূর্ণ অভাব।

"তখনও এটা আমি বুঝতে পারি নি। বুঝ্‌তে পেরেচি একেবারে শেষে। লোকে যে সময় থাক্‌তে বোঝে না—এইটিই অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, বোঝে না বলেই এই মহিলাটিরই মত এমন সব কথা বলে, যা একেবারেই অসম্ভব।

"গেল বছর আমাদের বাড়ীর কাছেই বহু কৃষক রেলের রাস্তা বাঁধবার কাজ কচ্ছিল। তারা যা খাবার খায় তা অতি সাধারণ, কিন্তু এই রুটি খেয়ে মাঠে খেটে খুটেও তারা জীবন্ত থাকে, প্রাণবন্ত হ'য়ে ওঠে। কি সুন্দর স্বাস্থ্য তাদের! তারা যখন রেল কোম্পানীর কাজে ঢোকে তখন তাদের মাংসও খেতে দেওয়া হয়, কিন্তু তারা যেমন মাংস খায় খাটেও তেমনি হাড়ভাঙা খাটুনি। আমরা খুব দামী, খুবই উত্তেজক জিনিষ খাই, মদ ত খাই-ই, অথচ শারীরিক পরিশ্রম মোটেই করি না। এর ফল কি হয়? এরই ফলে মানসিক উত্তেজনা হয়, এরই ফলে কদর্য্যচিন্তা আমাদের মনে বাসা বেঁধে বসে, আমাদের জীবনটা হয়ে ওঠে কৃত্রিম, আর ব্যারাম হয় কেবল প্রেমে পড়া।

"আমি প্রেমে পড়লুম। প্রেমে পড়ার বিশেষ লক্ষণ আমার

একটিও বাদ যায় নি। কাব্যি আমার সমস্ত মনটাকে দখল করেছিল, কিন্তু এই যে কাব্যি, এই যে প্রেম, এর মূলে কি ছিল?

এর মূলে ছিল উত্তেজক খাদ্য, অলসতা আর দূষিত আবহাওয়ায় পুষ্ট আমার কলুষিত মন। যদি আমাদের একত্রে নৌকা-ভ্রমণের ফন্দীটি না করা হ'ত, যদি কাপড় চোপড়ের অত চটক না থাকৃত, যদি আমার স্ত্রী খুব সাধারণ কাপড় চোপড় পরে বাড়ীতেই থাকৃত, আর যদি আমার নৈতিক চরিত্র ভাল হত, আমার মন যদি অতটা হাল্কা হয়ে না যেত—তা হলে প্রেমটা অত সস্তা হত না, এবং আমার জীবনে তার পরে যা ঘটেচে তাও কখনো ঘট্‌ত না।

৭

তারপর অতি বিনীতভাবে আমাকে তিনি বলিলেন,—"আশা করি আপনি আমার ওপর রাগ করবেন না, সত্যি জিনিষটা প্রায়ই অপ্রিয়, হয় ত এই অতি অপ্রিয় সত্যই আমি বল্‌ব, আমায় ক্ষমা করবেন।

"আমি ফাঁদে পড়লুম। এখনকার দিনে বিয়েটাকে একটা ফাঁদ বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। মেয়ে বড় হলে তাকে বিয়ে করতে হবে; আর তাকে বিয়ে করবার যুবকেরও অভাব নেই, যদি সে দেখ্‌তে নেহাৎ কদাকার না হয়। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল মেয়ে বড় হ'লে বাপ মা বিয়ের চেষ্টা করত, উপযুক্ত পাত্র দেখে বিয়ের বন্দোবস্ত করত। এ নিয়মটা এখনও হিন্দু, মুসলমান, চীনবাসী এবং রাসিয়ারও নিম্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে প্রচলিত আছে, অর্থাৎ পৃথিবীর খুব বেশীর ভাগ লোকের মধ্যেই এ নিয়মটিই চলে আসচে, আর নেহাৎ কমের ভাগের

মধ্যে উঠে গেচে। নেহাৎ মুষ্টিমেয় কতকগুলো লোক ভাব্‌লে তারাই শিক্ষা এবং সভ্যতার (?) আলোক পেয়েচে, সুতরাং তারা উঠে পড়ে লাগ্‌ল বিবাহের এক অভিনব প্রথা আবিষ্কার করতে। এই নতুন প্রথার বিশেষত্ব কি?

"মেয়েরা সেজে গুজে বাড়ীতে বসে আছে, আর যুবকরা তাদের কাছে গিয়ে দেখে শুনে তাদের পছন্দ ক'রে নিচ্ছে। এ যেন এক মজার বাজার। মেয়েরা মুখ ফুটে তখন কিছু বল্‌তে না পারলেও তাদের অন্তরের কথা হচ্ছে এই, "আমাকে গ্রহণ কর প্রিয়তম, ওকে না। ওর চেয়ে আমি কত সুন্দর।" পুরুষরাও পাঁচজনকে দেখে একবার এর দিকে আর একবার তার দিকে যায়, তাদের মাথা যায় ঘুলিয়ে; শেষে এমন এক জায়গায় তাদের পা পিছ্‌লে যায় যে পড়ে গিয়ে ফাঁদে আট্‌কে পড়ে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি করতে চান? নিজের বিয়ের প্রস্তাব মেয়েরাই পুরুষদের করবে এটা ত আপনি নিশ্চয়ই চান না?"

আমি যে কি চাই তা সত্যই আমি জানি নে। কিন্তু এটুকু মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝি যে, পুরুষ ও নারীর সর্ব্বপ্রকারে সমকক্ষতারই যদি দরকার নেহাৎ হয়, তা হলে যথার্থ সমকক্ষতাই হোক্‌।

"যদি অন্য লোক বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করলে বর কনের পক্ষে তা অত্যন্ত হীন ও অপমানজনক হয়, তা হলে এখন যে ব্যাপার চল্‌চে তা হাজার গুণ বেশী হীন ও অপমানজনক। কোন্‌টায় অনিষ্ট বেশী হচ্ছে? আজ নারীকে তার সমস্ত সম্মান, সমস্ত মর্য্যাদা খোয়াতে হচ্ছে। অন্য লোকের দ্বারা যে বিবাহ হয় তাতে ভাল মন্দ, আশা বা আশঙ্কা দুজনেরই সমান; কিন্তু আজকাল ত নারী দাঁড়িয়েচে নানা

রকমের ছল চাতুরী, নানান রকমের কায়দা করে নিজেকে বিক্রী করবার জন্য। নারীকে আজ কত প্রবঞ্চনা অবলম্বন করতে হয়েচে। এ বিরাট অধঃপতনের মূল কোথায় বেশ ক'রে একবার ভাবুন।

"যদি কোন মাকে বা তার মেয়েকে সত্যি কথা বলা যায় যে তাদের চাল চলন, হাব ভাব, কথাবার্ত্তা, পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতির একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে বর জোগাড় করা অর্থাৎ পুরুষ ধরা, তা হ'লে কি আর রক্ষা আছে? তারা এমন কথা নিশ্চয়ই অপমান বলে মনে করবে। কিন্তু এ কথা যে খাঁটি সত্যি তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাদের আর কোন কাজই নেই। নিরপরাধ সরলা যুবতীদের এই অবস্থা নিতান্ত বীভৎস নয় কি? এই বীভৎসতা, 'ভালবাসা'র এই কেনা বেচাই এখন আমাদের এই সমাজদেহে দুষ্ট ব্রণের মত গজিয়ে উঠেচে।

"মা যুবকদের কাছে বলেন—'আমার লিলি ছবি বড় ভালবাসে, আমার মেয়ে গানের নামে একেবারে পাগল, বেড়াতে পেলে বড়ই খুসী, খেল্‌তে এত ভাল পারে, আর এত সুন্দর নাচ্‌তে জানে যে তাকে সকলেই ভালবাসে।' এই যে সব কথা এর মর্ম্মার্থ হচ্ছে এই—'আমার লিলিকে নাও, লিলিকে নাও।' এদিকে লিলি ত মন ভোলাবার চেষ্টা কচ্ছেই। কি বীভৎস প্রবঞ্চনা, কি জঘন্য, মিথ্যা, কি ভীষণ হীনতা!"

যতটা চা তখনও কেট্‌লিতে ছিল তা একটা গ্লাসে ঢালিয়া বৃদ্ধ পজ্‌মিশেফ্‌ আর একবার খাইলেন। তখন চায়ের রং হইয়াছিল ঠিক পাতলা আল্‌কাতরার মত। কিন্তু সেই চা-ই তিনি অক্লেশে পান করিয়া চায়ের পাত্র, চিনি ইত্যাদি সব ব্যাগে পুরিতে লাগিলেন। পুরাতন ব্যাগটি বন্ধ করিয়া তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"হ্যাঁ, এই ব্যাপারেই আজ মানুষ অধঃপাতে যাচ্ছে, চরিত্রের দৃঢ়তা তার নষ্ট হয়েছে, আর আমরা এইটিকেই নারীর জাগরণ মনে কচ্ছি। মনুষ্যত্বের কি সুন্দর উন্নতি!"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মেয়েদের উন্নতি বা স্বাধীনতা কোথায়? যা কিছু সুযোগ, সুবিধা এবং অধিকার সবইত পুরুষদের। নারীদের আমরা কি অধিকারটা দিয়েছি?"

আমাকে আর বলিতে হইল না। তিনি অমনি বলিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিও ঠিক এই কথাই বল্‌তে যাচ্ছিলুম। দেখুন, এদিকে দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে যে নারীকে কোন ক্ষমতাই দেয়া হয় নি, তাকে যতদূর সম্ভব খাটো করেই রাখা হয়েচে, আবার অন্যদিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে নারীই সর্ব্বশক্তিশালিনী। ইহুদীদের কথাই ধরা যাক্। এক দিকে যেমন তাদের ওপর অত্যাচার করা হয়েচে তারা অন্যদিক দিয়ে প্রতিপত্তি লাভ করে ক্ষতিটা পূরণ করে নিয়েচে। আমাদের মেয়েদের অবস্থাও হয়েচে তাই। ইহুদীদের দেখে মনে হয় যে তারা যেন বল্‌চে,—'তোমরা আমাদের শুধু ব্যবসাদার হয়েই থাক্‌তে বল, বেশ, আমরা ব্যবসায়ে তোমাদের হারাব, ব্যবসায়েই

আমরা তোমাদের ওপর প্রতিপত্তি খাটাব।' মেয়েরাও যেন বল্‌তে চায়,—'তোমরা আমাদের শুধু আমোদ প্রমোদের একটা যন্ত্র করেই রাখ্‌তে চাও, আমরাও তোমাদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাব।'

"নারীকে স্বাধীনতা না দেওয়ার অর্থ এ নয় যে, সে ভোট দিতে পারবে না, বিচারক হতে পারবে না, কাউন্সিলে যেতে পারবে না, কিংবা রাজনীতিক ব্যাপারে, ব্যবসায়ে বা অন্যান্য ব্যাপারে যোগ দিতেও পারবে না। পুরুষ ও নারী সম্বন্ধীয় সামাজিক ব্যাপারে পুরুষেরই প্রাধান্য থাকবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, পুরুষের মন ভুলিয়ে তাকে স্বামী করবার অধিকার নারীর নেই। যতদিন পুরুষ তাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করতে রাজী না হয়, ততদিন তাকে অপেক্ষা করতেই হবে। আপনি হয়ত বল্‌বেন, 'সে কি ভয়ানক কথা! পুরুষ যদি মন না করে তবে?' বেশত পুরুষ তা হলে নিজেইত বঞ্চিত হবে। সে যদি বঞ্চিত হতেই চায় হোক্ সে বঞ্চিত। নারী এখন হয়েচে পুরুষেরই একচেটে সম্পত্তি, শুধু ভোগ-বিলাসের বস্তু, নারী তাই তাকে ক্রমাগত নাকে দড়ি দিয়ে নাচাচ্ছে, ঘোরাচ্ছে, এবং এই রকম নাচিয়ে আর ঘুরিয়েই সে তার অধিকারের ক্ষতিটি পূরণ করে নিচ্ছে। পুরুষকে মুগ্ধ করবার বিদ্যাটি আয়ত্ত করবার জন্যই নারী এত ব্যস্ত যে ভাল মন্দ বেছে নেবার শক্তি পুরুষের থাকে না। পুরুষ এতই মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ে যে, আর বেছে নেয়ার অধিকার শুধুই একটা অসার বাহ্যানুষ্ঠানে পরিণত হয়েচে। প্রকৃতপক্ষে নারীই স্বামী নির্ব্বাচন করে এবং তার ভক্তি দ্বারা পুরুষকে জয় করার পর নিজের শক্তিরই অপব্যবহার করে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "পুরুষের ওপরে নারী যে এত বড় শক্তি প্রয়োগ কচ্ছে তা কিসে প্রকাশ পাচ্ছে?"

তিনি বলিলেন, "প্রকাশ পাচ্ছে সব জায়গায় সব বিষয়েই। একটা উদাহরণ দিলে কথাটা বেশ পরিষ্কার হবে। যে কোন একটা বড় সহরের বড় বড় দোকানগুলো একবার দেখুন দেখি। দোকানগুলো দেখেত মাথাই ঘুরে যাবে, ধারণাই করতে পারবেন না যে কত টাকার জিনিষ তাতে আর কত লোকের কত অসীম পরিশ্রমে সেই জিনিষ-গুলো তৈরি হয়েচে। যাই হোক, তারপর দোকান গুলোয় একবার ঢুকে জিনিষ গুলো বেশ করে নজর করুন। দেখ্‌বেন যে শতকরা নব্বুইটি জিনিষই পুরুষের জন্য নয়। শুধু স্ত্রীলোকের ব্যবহারের জন্যই বিলাসি-তার অসংখ্য উপকরণের উৎপত্তি হয়েচে এবং হচ্ছে। একবার কারখানা গুলোর কথা ভেবে দেখুন বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিষের চেয়েও স্ত্রীলোকের সখের জিনিষ ঢের বেশী তৈরি হচ্ছে কিনা। কত রকমের খেলনা, পুতুল, আসবাব পত্র, পোষাক পরিচ্ছদ—কত হাজার হাজার নির্ব্বাসিত লোক কারখানার কেনা গোলাম হ'য়ে তিলে তিলে নিজেদের দেহ পাত করে তৈরি কচ্ছে শুধু স্ত্রীলোকের খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য। শুধু নারীর খেয়াল আর সখ বজায় রাখবার জন্যই প্রায় সকল পুরুষকেই হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হচ্ছে—কত লোককে জেলেও যেতে হচ্ছে। এইত সমাজের অবস্থা আর এইত আমাদের সভ্যতা ও শিক্ষা!

"পুরুষ নারীকে তার সমান অধিকার দেয়নি বলে, খাটো করে রেখেচে বলে পুরুষের উপরে নারী এমনি করেই প্রতিশোধ নিচ্ছে; ফাঁদ পেতে নানান কৌশলে মানুষকে মুগ্ধ করে আটকে ফেলেচে! সমাজের যে উচ্ছৃঙ্খলতা, যে অস্বাভাবিক অবস্থা হয়েচে আর মূলে হচ্ছে এই ব্যাপার। পুরুষেরা শুধু ভোগের মসলা জোগাচ্ছে বলেই পুরুষ স্থির চিত্তে নারীর কাছে যেতে পারে না। তার কাছে গেলেই

পুরুষ অভিভূত হ'য়ে পড়ে, তার সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধিও অবশ হয়। আমারও এক সময় ছিল যখন বল নাচের পোষাকপরা কোন যুবতীকে দেখ্‌লে আমার মোটেই ভাল লাগ্‌ত না, আজ কালত দেখ্‌লেই শিউরে উঠি। কারণ এর মধ্যেও তরুণে এতটা বিষম অকল্যাণ রয়েচে। যাতে মানুষের অকল্যাণ রয়েচে তেমন কোন জিনিষেরই থাক্‌বার অধিকার ও নেই, এর সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হওয়া একান্তই দরকার।"

এইখানে একটু থামিয়াই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার কথা শুনে আপনার বোধ হয় হাসি পাচ্ছে। কিন্তু এটাত হেসে উড়িয়ে দেবার জিনিষ নয়। মানুষের যে বীভৎসরূপ সমস্ত মনুষ্যত্বের মূলে প্রচণ্ড আঘাত কচ্ছে, সমাজ দেহে যে বিষম বিষ সংক্রামিত কচ্ছে তা আর অবহেলা করা চলে না। খুব শীঘ্রই এমন একদিন আসবে যে দিন মানুষ এটা হাড়েহাড়ে বুঝবে এবং সবিস্ময়ে ভাববে যে এমন নগ্ন বীভৎসতা এমন জঘন্য কুরুচি এবং দুর্নীতি সমাজে কি করে চলেছিল। একদিন আসবেই যেদিন আমাদের এই সমাজেও মানুষ শুধু দেহের পূজাই করবে না, বাইরের চটকে আর ভুলবে না; তার দৃষ্টি থাকবে অন্তরের পবিত্রতা, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের দিকে। এটা কি অস্বীকার করা যায় যে পুরুষ নারীর বাইরের সৌন্দর্য্যের—দেহেরই পূজা করে, তার নজর শুধুই থাকে নারীর দেহের দিকে। এতে কি সমাজের ঘোর বিপদের আশঙ্কা নেই, এতে কি মানুষের ইন্দ্রিয় বিকার জন্মায় না? এ ফাঁদ পাতা বন্ধ করা হয় না কেন? আগে বাপ-মা ছেলেমেয়ের যে বিয়ে দিতেন তাতে এত কাল পৃথিবীর কি অনিষ্ট হয়েচে? এই যে চটকদার পোষাক পরিচ্ছদ, এই যে রং চং, এই যে নানান ছলা কলা—এসব কিসের জন্য আমায় বুঝিয়ে দিন। এ অতি ভীষণ ফাঁদ, মানুষ মজানো ফাঁদ।

খানিকক্ষণ তিনিও কথা কহিলেন না, আমিও চুপ করিয়া রহিলাম। তারপর তিনিই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমিও ফাঁদে প'ড়ে গেলুম। সাধারণতঃ লোকে যাকে 'ভালবাসা' বলে, আমারও সেই 'ভালবাসা' হ'ল। এটা কি ভালবাসা, কিংবা সাময়িক মোহ ভাল করে ভেবে দেখুন। আমার মনে হতে লাগল আমার 'ভালবাসা'র পাত্রী একেবারে "স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা," আর একটা পুরুষ যতদূর ভাল হতে পারে তত ভাল বলেই আমি তার কাছে নিজেকে জাহির করতে লাগলুম। তারপর বিয়ে হ'ল।

"টাকার জন্য আমি বিয়ে করি নি। আমার পরিচিত অনেক শিক্ষিত লোককে, আমার কত বন্ধু বান্ধবকে দেখেচি, তারা কেউ বা বিয়ে করেচে টাকার জন্যে, কেউ বা শ্বশুরের সম্পত্তি পাওয়ার জন্যে, কেউ বা মুরুব্বী পাওয়ার জন্যে আবার কেউ বা স্ত্রীর সাহায্যে সমাজে পাঁচ জন বড় লোকের কাছে খাতির পাওয়ার জন্যে। আমার বিয়ে করার ভিতরে এ রকম কোন উদ্দেশ্যই ছিল না, এ শুধু বিয়ে করার জন্যেই বিয়ে। তা ছাড়া আমি ছিলুম ধনী আর সে ছিল গরীব। এতে আমি মনে মনে একটু গর্ব্বও অনুভব করতুম। আমার গর্ব্বের আরও একটি কারণ এই ছিল যে, আমি স্ত্রীর কাছে কখনো অবিশ্বাসী হব না। এই বিশেষ গর্ব্বটুকু অনুভব করতুম এই জন্যে যে, অনেকেই বিয়ে করবার পূর্ব্বেও যেমন অসৎ ও উচ্ছৃঙ্খল থাকে, বিয়ে করার পরেও ঠিক তেমনি থাকে, আমি এ অপরাধে অপরাধী ছিলুম না।

স্ত্রীকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে লাগলুম, তার কাছে খুবই বিশ্বাসী রইলুম। আমার যা কিছু দোষ পূর্ব্বে ছিল তা একরকম দূর হ'ল, এই জন্যই ভাবতুম আমার স্ত্রী আমাকে নিশ্চয়ই দেব চরিত্রের লোক বলে মনে করবে।

"খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের পূর্ব্ব রাগের পালা শেষ হয়েছিল। আমার এখনও সব কথা মনে আছে। স্বামী-স্ত্রীর প্রেম বন্ধনকে খুব পবিত্র বলা হয়, বিবাহ একটা আধ্যাত্মিক ব্যাপার বলেই শাস্ত্রে লেখে, কিন্তু আমাদের পরস্পরের কথাবার্ত্তা, চাল চলন ও ব্যবহারে তা কোথাও প্রকাশ পায় নি। আধ্যাত্মিকতার লেশমাত্রও কোনখানে আমরা টের পাই নি। যখন আমরা দুজনেই শুধু এক জায়গায় থাকতুম, তখন ত কোন কথাই বেরুত না। বল্‌বার ইচ্ছা হয়ত থাক্‌ত, কিন্তু আরম্ভ করাটাই ছিল ভারি শক্ত। অতি কষ্টে দু' একটা কথা বলেই আবার চুপ করে থাক্‌তুম। খাওয়া-দাওয়া আমোদ-আহ্লাদ, বেড়ানো ইত্যাদি নিয়েত অনেক বারই অনেক কথা হয়েচে, কাজেই নতুন কিছুই বলবার ছিল না অথচ না বল্‌লেও নয়। কিন্তু কই? আমরা যে একমন একপ্রাণ হয়ে ভগবানের সেবা করব, সচ্চিন্তা ও ধর্ম্মকর্ম্ম করে জীবন ও মন পবিত্র করব—পূর্ব্বরাগের সময়ত একবারও আমাদের মধ্যে সে কথা হয় নি। আমাদের হয় নি, কারও হয় বলেও শুনি নি। সকলেরইত এই একই ভাব, একই অবস্থা। আজকেই বৃদ্ধ ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটি বল্‌লেন যদি ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে পুরুষ ও নারীর প্রকৃত মিলন হয়, তা হলে এই যৌতুক, টাকা পয়সা, দামী দামী উপহার, পোষাক পরিচ্ছদের এত আড়ম্বরতা কিছুই থাকে না। কিন্তু আমাদের দেশে ধর্ম্মে বিশ্বাস করে, ভগবানের বাণী অনুসরণ করে এরকম লোকত পাওয়াই যায় না, কাজেই ধর্ম্মানুমোদিত কোন অনু-

ষ্ঠানই আমাদের হয় না। সব ব্যাপারই কৃত্রিম—শুধু লোক দেখানো আর লোক ঠকানো। এমন লোক আমাদের মধ্যে অতি বিরল যার বিয়ে হওয়ার পূর্ব্বেই বিয়ে হয় নি। প্রত্যেক পঞ্চাশ জনের মধ্যে এমন একজন লোক পাওয়াও দুষ্কর যে সুযোগ ও সুবিধা পেলেই পবিত্র দাম্পত্য প্রেমে বিশ্বাসঘাতকতা করে না। এ না হলে বিয়ে হতে হতেই এত ছাড়াছাড়ি হয় কেন? কথা হচ্ছে এই গীর্জ্জায় গিয়ে শাস্ত্রের কয়েকটি বচন আউড়ে যে বিবাহের অনুষ্ঠান হয় তা শুধু কয়েকটি সর্ত্ত ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই সর্ত্ত যখন পালন করা সুবিধাজনক হয় না তখনই স্বামী স্ত্রী সে সর্ত্ত ভেঙে ফেল্‌তেও কুণ্ঠা বোধ করে না, অর্থাৎ স্বামীর জন্য স্ত্রী কিম্বা স্ত্রীর জন্য স্বামী কোন রকমের অসুবিধা বা কষ্ট ভোগ করিতেই রাজী নয়। তখনই ছাড়াছাড়ি হয়, আবার তারা নতুন শিকারের খোজে বেরোয় আবার গীর্জ্জায় যায় শাস্ত্র বচন আওড়ায়, অর্থাৎ যথা পূর্ব্বং তথা পরম্। এই খানেই হচ্ছে প্রকৃত গলদ, এটি বিশেষ করে ভাববার বিষয়। ব্যাধির এই মূল কারণ দূর না হলে বড় বড় বচন ঝেড়ে, যুক্তির জাল বুনে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করার চেষ্টা একটা বিরাট পাগ্‌লামি।”

১০

তিনি যা বলিলেন আমি খুব মন দিয়া শুনিতে লাগিলাম বটে, কিন্তু ভাবিবার অবকাশ তখনও আমার হইয়া উঠিল না। কারণ তিনিই আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, “সকলেই এই রকম বিয়ে করে আমিও করেছিলুম। বিয়েয় পরেই সকলের মত আমাদেরও আরম্ভ হ'ল ‘মধুচন্দ্র’। বিয়ের পরই কোথায় গিয়ে আমরা দুজনে

কিছুদিন কাটাব তা আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলুম। কি সুন্দর নাম এই 'মধুচন্দ্র'। বিয়ের পরই স্বামী স্ত্রীর একত্রে আলাদা একটা জায়গায় কিছু আনন্দে কাটানোর নামটা এমনি সুন্দর না-ই বা হবে কেন?

"একদিন প্যারিসে নানান রকম দৃশ্য দেখে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। দেখলুম এক জায়গায় একটা সাইন্‌বোর্ড টাঙানো আছে আর তাতে একটি দাড়ীওলা মেয়ে মানুষ আর একটি সিন্ধুঘোটকের ছবি আঁকা আছে। দেখবার ভারি ইচ্ছা হ'ল। এক ফ্রাঙ্ক্ খরচা করে ভেতরে ঢুক্‌লুম। ঢুকেইত চক্ষু স্থির আর কি! দাড়ীওলা মেয়ে মানুষটি একটি পুরুষ, শুধু মেয়ে মানুষের পোষাক পরা, আর সিন্ধুঘোটকটি একটি কুকুর—সিন্ধু ঘোটকের চামড়ায় ঢাকা, একটা চৌবাচ্চায় সাঁতার কাটছে। আমার এমন বিরক্তি বোধ হল যে কি আর বলব। বেরিয়ে আসবার সময় এই অদ্ভুত প্রদর্শনীর মালিক আমার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে এলো, আর বাইরে যে সব লোক ছিল, আমাকে দেখিয়ে দিয়ে তাদের বল্‌লে, 'আপনারা এই ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস্ করে দেখুন যে এ দেখবার মত জিনিস কিনা। আসুন, আসুন, আপনারাও ভেতরে আসুন। প্রত্যেকের এক এক ফ্রাঙ্ক।' আমি আর কি বলি? পয়সা দিয়ে যে ওরকম জিনিষ দেখা উচিত নয় তা তাদের বল্‌তেও লজ্জা হ'ল, এমনি ঠকেই এসেচি। বিবাহের পর আমাদের 'মধুচন্দ্র' যাপনও ঠিক এই রকম ব্যাপার। এ হচ্ছে ঠিক দিল্লীকা লড্ডু, যে খায় সেও পস্তায় আর যে না খায় সেও পস্তায়।

"যখন প্রথম চুরুট খেতে আরম্ভ করি তখনকার কথা আমার বেশ মনে আছে। মুখটা একেবারে তেতো হয়ে যেত, ঠোঁট দুটো একটু একটু জ্বল্‌ত, মাথাটা ঘুরৃত, গাটা বমি বমি করত; তবুও ঢোক গিলে

সকলকে দেখাতুম যে চুরুটটা আমার বেশ ভালই লেগেচে। এ ব্যাপারটাও ঠিক এই রকমের।"

আমি বলিলাম, "মধুচন্দ্র সম্বন্ধে আপনার ধারণাত দেখ্‌চি অতি অদ্ভুত। যদি দু'জনের একত্রে বাস করা এতই বিরক্তিকর হয় তা হ'লে মানব জাতিরই বা অস্তিত্ব থাক্‌বে কি করে?"

তিনি জবাব দিলেন, "কি করা উচিত তাইত আমায় জিজ্ঞেস্ কচ্ছেন? ছেলেবেলা থেকেই সংযম শিক্ষা দেয়া সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য। সংযম হ'ল জীবনের মেরুদণ্ড। কিন্তু সংযমের উপকারিতা সম্বন্ধে আপনি উপদেশ দিন, নৈতিক চরিত্র রাখ্‌বার কথা বলুন, দেখ্‌বেন সকলেই চেঁচিয়ে উঠবে, সকলেই আপনার ওপরে চটবে! এমনি চমৎকার আমাদের শিক্ষা আর সভ্যতা!"

আমাদের উপরে একটা লণ্ঠন টাঙানো ছিল। সেই লণ্ঠনটা দেখাইয়া দিয়া তিনি আমায় বলিলেন, "এই আলোটা আমার চোখে বড্ড লাগ্‌চে। আলোটার চারদিকে ঢাকনি দিয়ে দেব? আপনারত কোন অসুবিধে হবে না।"

আমার যে তাতে কোন আপত্তিই নাই, কোন অসুবিধাই যে আমার হবে না তাঁকে জানাইলাম। তিনি অমনি উঠিয়া আলোর উপরের ঢাক্‌নিটা টানিয়া দিয়া আবার বসিলেন।

তাঁর বলিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই আমি আবার তাঁকে সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার নীতি কার্য্যতঃ অনুসরণ করলে মনুষ্য জাতি খুব শীঘ্রই লোপ পাবে না কি?"

একটুকাল চুপ করিয়া ভাবিয়াই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি জান্‌তে চান কি করে মনুষ্য জাতি টিকে থাক্‌বে?"

বলিয়াই ঠিক আমার সামনে আসিয়া বসিয়া পা দুইটি ফাঁক করিয়া

ছড়াইয়া দিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের জন্য এই মনুষ্য জাতি টিকে থাক্‌বে।"

আমি বলিলাম, "কেন? তা না হলে আমরা যে মোটেই থাকতুম না।"

"আমরা থাক্‌ব কেন?"

"থাক্‌ব কেন? এ বড় অদ্ভুত কথা! বেঁচে থাক্‌বার জন্যেই থাক্‌ব।"

"বেঁচে থাক্‌ব কিসের জন্য? যদি জীবনের কোন উদ্দেশ্য না থাকে, লক্ষণই না থাকে, যদি বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য হয় শুধু বেঁচেই থাকা, তা হলে বেঁচে থাক্‌বার প্রয়োজনটা কি? জীবনের কি কোন প্রয়োজন নেই, কোন উদ্দেশ্য নেই? যদি থাকে তা হলেও যখনই উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে তখন হতেই আর জীবনের দরকার থাকবে না, মানুষেরও আর বেঁচে থাকবার কোন প্রয়োজন হবে না। এ খুবই স্পষ্ট কথা।"

এমন আবেগ ও উচ্ছ্বাসের সহিত তিনি এই কথাগুলি বলিলেন যেন তাঁর এই ধারণাকে তিনি খুবই মূল্যবান বলিয়া মনে করেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমার কথা গুলো বেশ করে ভেবে দেখুন। যদি মানুষের জীবনের লক্ষ্য হয় সুখ, সাধুতা ও ভালবাসা, প্রাচীন মহাপুরুষগণের মতে যদি এই হয় যে সমস্ত মানুষ প্রেমের সূত্রে আবদ্ধ হবে, পৃথিবীটা মানবের মহামিলনক্ষেত্রে পরিণত হবে, যুদ্ধের তরোয়াল ভেঙে তাদের লাঙল তৈরি করতে হবে, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা ও প্রেমের দ্বারা সকলকে আপন করে নিতে হবে। তবে এই লক্ষ্য পূর্ণ হওয়ায় বাধাটা কি? বাধা হচ্ছে প্রবল রিপু। সমস্ত রিপুর মধ্যে প্রবলতম হচ্ছে কাম রিপু, এর মত মারাত্মক রিপু আর নেই। আমরা যদি রিপু দমন করতে চেষ্টা করি এবং অন্য রিপু দমনের সঙ্গে সঙ্গে যদি

কামরিপুও দমন করতে পারি তা হলেই মহাপুরুষগণের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হবে, মানুষ প্রেমের বন্ধনে মিলিত হবে, মানুষের বেঁচে থাকবার প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, আর উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেলে মানুষের অস্তিত্ব বাড়াবার কোনও কারণ থাকবে না। কথাটা ভেবে দেখ্‌বেন।

"যতদিন মানুষ বেঁচে থাকে ততদিনই তার একটা আদর্শ থাকে, একটা আদর্শ নিয়েই সে চলে ; আর মানুষের আদর্শও পশুর আদর্শ নয়। পশুর আদর্শ শুধু ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি—আর কিছুই নয়, মানুষের আদর্শ দেবত্ব। এই দেবত্ব লাভ করতে হলে চাই সব বিষয়ে আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধি। এই আদর্শের দিকেই যাওয়ার ঝোঁক মানুষের আছে। এখন এর পরিণামটা একবার চিন্তা করে দেখুন।

"যে উদ্দেশ্য পূর্ণ করবার জন্য ভগবান বর্ত্তমান মানবকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন সে ত সে উদ্দেশ্য পূর্ণ করে নি। কেন ? রিপু, বিশেষতঃ প্রবলতম কামরিপুর জন্যই হয় নি। বর্ত্তমান মানবের দ্বারা এই রিপু দমন না হওয়ার জন্যই নতুন মানবের আবির্ভাব হল, এই নতুন মানবের দ্বারা উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রইল। যদি তাকে দিয়েও না হয় তার কারণও ঐ একই। আবার নতুন মানবের আবির্ভাব হ'ল, এই রকম করে অনন্তকাল ধরে একের পর এক নতুন নতুন মানবের আবির্ভাব চলতে লাগল,—যতদিন না উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়, মানুষ তার চরম লক্ষ্যে পৌছতে পারে, সমস্ত মানুষ প্রেমে বদ্ধ হয়।

"অন্যদিক দিয়ে বিষয়টি বিচার করে দেখা যাক্‌। উদাহরণস্বরূপ ধরে নেয়া যাক যে, ভগবান মানুষ সৃষ্টি করেচেন কোন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্যে। ভগবান তাকে কোনই রিপু দিলেন না কিন্তু তাকে করলেন নশ্বর, কিংবা তাকে অবিনশ্বর করে দিলেন, এ রকম হলে কি হয় ? তা হলে পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারে এই হয় যে, মানুষ

বেঁচে থাকবে তার জীবনের উদ্দেশ্য সাধন না করেও, তার পর সে মরবে। ভগবানের তখন নতুন সৃষ্টির প্রয়োজন হবে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য। কিন্তু শেষোক্ত ব্যাপারে, অর্থাৎ মানুষ যদি অবিনশ্বর হয়, আর যদি বহু সহস্র বৎসর পরে জীবনের চরমলক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছুতে পারে, তবে আর তার বেঁচে থাক্‌বার প্রয়োজন কি? যে উদ্দেশ্যে জীবন ধারণ করা সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেলে তার জীবন দিয়ে ভগবান কি কববেন? তার জীবনের আর মূল্য কি? অবশ্য এটা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার, কারণ মানুষকে অবিনশ্বর করার চেয়ে নশ্বর করে নতুন মানুষের দ্বারা উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা করানো ঢের সহজ ও সঙ্গত। তাই ভগবান মানুষকে নশ্বরই করেছেন। কাজেই পরিষ্কার বুঝ্‌তে পারা যাচ্ছে যে মানুষকে যে ভাবে তিনি পৃথিবীতে পাঠিয়েচেন সেইটেই সব চেয়ে ভাল। মানুষ ভুলবে না যে সে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই পৃথিবীতে এসেচে। সমস্ত রিপু দমন করে সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করবার জন্য তাকে ক্রমাগত চেষ্টা করতে হবে, তবেই তার জীবন ধারণ সার্থক হবে, সুন্দর হবে।

"যে ভাবে কথাগুলো বল্‌লুম তা বোধ হয় আপনার মোটেই ভাল লাগচে না। খুব সম্ভব আপনি ক্রমোন্নতি-বাদী। তা হলেও আমরা কথার সত্যতা আপনাকে দেখ্‌তেই হবে। ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে মানুষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তার সেই শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করতে হবে। পশুর আদর্শ নিয়ে চল্‌লে ত তার চল্‌বে না। তার চাই আত্মসংযম আর আত্মশুদ্ধি। ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করা তাকে বন্ধ করতেই হবে। কিন্তু আমাদের সমাজ শুধু ইন্দ্রিয় ভোগের ইন্ধন জোগাবার জন্যই ব্যস্ত।"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "হ্যাঁ, আপনি বলেচেন যে সৃষ্টি লোপ পাবে। কিন্তু এমন কেউ আছে কি

যে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য সাধন সম্বন্ধে যা বল্লুম তাতে সন্দেহ করে? তা ছাড়া প্রাচীন এবং আধুনিক মনীষী, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক—সকলেই বিশ্বাস করেন পৃথিবী একদিন ধ্বংস হবেই, শীঘ্রই হোক আর বিলম্বেই হোক। ধ্বংস অনিবার্য্য, সুতরাং নীতি শাস্ত্র যদি এই উপদেশ দেয় তাতে বিস্মিত হওয়ার কি কারণ আছে?"

কথা কওয়া বন্ধ করিয়া তিনি চুরুট ধরাইয়া টানিতে লাগিলেন। চুরুটটি একেবারে শেষ করিয়া ব্যাগটি খুলিয়া আরও কয়েকটি চুরুট বাহির করিয়া তাঁর চুরুটের কৌটায় রাখিলেন।

আমি বলিলাম "আপনি যা বল্‌চেন তা বুঝ্‌তে পাচ্ছি।"

তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, রিপুকে যত রকম যুক্তি দিয়েই সমর্থ করুন না, যত ভাল করেই চাপা দিন না, রিপু যে অত্যন্ত কুবস্তু তাতে আর সন্দেহ নেই। রিপু অতি ভয়ানক জিনিষ, একে কোন রকমেই প্রশ্রয় দেয়া যেতে পারে না, এর সঙ্গে মানুষকে ক্রমাগতই লড়াই করতে হবে। কিন্তু আমাদের এই সমাজ এই মারাত্মক জিনিষকে ক্রমাগতই প্রশ্রয় দেয়। আমাদের খৃষ্টান-ধর্ম্ম-শাস্ত্র বলেন—'যে ব্যক্তি কাম-কলুষনেত্রে কোন স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করে সে মনে মনে সেই স্ত্রী-গমন করেচে।' এই কথাটি যে কেবল পরস্ত্রীর বেলায়ই প্রযোজ্য তা নয়, নিজের স্ত্রীর বেলায়ও প্রযোজ্য। আধুনিক জগতের সকলের মতই ঠিক এর উল্টো, সুতরাং তাদের মতানুসারে যা হওয়া উচিত তা-ই হচ্ছে। এই যে বিবাহের পর নব দম্পতীর নানান জায়গায় ভ্রমণ, নানা রকমের ফুর্ত্তি করা, আত্মীয়-স্বজন সকলকে ছেড়ে, প্রায়ই খুব দূরে কিছুকাল থাকা—এর অর্থ কি? এর অর্থ আর কিছুই নয়—এ শুধু অবারিত আমোদ-প্রমোদ, বিলাস-ব্যসনের সুযোগ দেয়া।

অবিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়সেবা প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ, আর তা যে ভগবানের বিধান নয় সে কথা বলিলেও চলে। তাই তিনি সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখ না করিয়া বলিলেন, এ বিধান লঙ্ঘন করার জন্য নিশ্চয়ই শাস্তি ভোগ করতে হবে। কাজেই আমাদের সেই 'মধুচন্দ্র' সুশৃঙ্খলে, শান্তিতে ও সুখে কাটাবার জন্য যত চেষ্টাই করলুম সবই ব্যর্থ হল। এই সময়টা ছিল অত্যন্ত ঘৃণা, লজ্জা এবং বিরক্তির সময়। শেষটার অবস্থা একেবারে অসহ্য হয়ে উঠ্‌ল।

"বিয়ের পর মোটে তিন চার দিন কেটে গেছে। দেখ্‌লুম একদিন আমার স্ত্রী মুখ ভার করে বসে আছে। আমি কারণ জিজ্ঞেস্ করলুম, কোনই জবাব পেলুম না। তার মুখখানা যেন বিরক্তিতে বিকৃত হয়ে উঠ্‌ল। কাজেই মানভঞ্জন কর্‌বার জন্যে আমি তাকে টেনে বুকের কাছে নিয়ে এলুম, অভিমানিনী স্ত্রী আমার খোসামোদ আদর সোহাগ চায়। কিন্তু সে একেবারে এক ধাক্কা মেরে আমার বাহু বন্ধন খসিয়ে দিলে আর কেবল কাঁদতে লাগ্‌ল। আমিত হতভম্ব। ব্যাপারখানা কি? সে কিছুই বল্‌লে না, আর বল্‌তে পাচ্ছিলও না। কিন্তু আমি এটা খুব পরিষ্কার বুঝ্‌তে পাচ্ছিলুম যে একটা নিতান্ত অসহনীয় দুঃখে সে অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়েছিল, বিষাদে তার মন সম্পূর্ণ অবসন্ন হয়ে গিয়েছিল। সে যে জোর করে আমায় তফাতে ঠেলে দিয়েছিল, তাতেই বোধহয় আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ প্রকাশ পাচ্ছিল। অন্তরে সে আমার প্রতি যে বিতৃষ্ণা, যে ঘৃণা অনুভব কচ্ছিল তা সে

ব্যক্ত করতে পারলে না। বুঝ্লুম তার অন্তরে কি এক বিষম জ্বালা রয়েচে। আমি তাকে এর কারণ ক্রমাগত জিজ্ঞেস্ করতে লাগলুম। কতরকমের প্রশ্নই না করলুম। শেষটায় অতিকষ্টে সে বল্‌লে, 'মা কাছে নেই, বড্ড একলাটি মনে হচ্ছে।' আমার বুঝতে বিলম্ব হল না যে এটা ঠিক সত্যি কথা নয়। যাই হোক আমি তাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করতে লাগলুম, তাকে কত কথাই বললুম, কিন্তু তার মায়ের নামও উল্লেখ করলুম না। আমি বুঝতে পারিনি যে তার মায়ের কথাটা বলা একটা ছল মাত্র, তার মনে অশান্তির আর কোনও কারণ আছে। তার মায়ের কথা না বলায় সে আমার ওপরে চটে গেল, বললে, 'আমার কথা তুমি মোটেই বিশ্বাস কর নি। আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি তুমি আমায় ভালবাস না।' আমি তাকে দোষ দিয়ে বল্‌লুম যে সে অত্যন্ত খেয়ালী, অত খেয়াল নিয়ে থাকা ভাল নয়। এই কথা বলতেই তার মুখের ভাব হঠাৎ বদ্‌লে গেল।

তার মুখ সেই বিষাদ-মলিন রাগে লাল হয়ে উঠ্‌ল, আমাকে স্বার্থপর ও নিষ্ঠুর বলে যতদূর সম্ভব তিরস্কার করলে। আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। তার মুখ চোখ সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন আমার প্রতি ঘৃণা আর বিদ্বেষ প্রকাশ কচ্ছিল।

আমার মনে যে তখন কি একটা আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছিল তা আজও স্পষ্ট মনে আছে। ভাবলুম এ কি? এর মানে কি? কেন এ রকম হল? এই ভালবাসা, আর এই কি প্রাণে প্রাণে আত্মায় আত্মায় মিলন? যাকে আমার ভালবাসা কতবার জানিয়েচি, যে আমাকে তার ভালবাসা কতবার কতভাবে জানিয়েচে এ কি আমার সেই স্ত্রী, না আর কেউ? এও কি হতে পারে? এ নিশ্চয়ই আর কেউ, সে কিছুতেই নয়।

"তাকে শান্ত করবার জন্য কত চেষ্টাই না করলুম, কিন্তু সে এমন বিদ্বেষ, এমন ঘৃণা এবং শত্রুভাব দেখাতে লাগ্‌ল যে আমি ক্রোধে একেবারে উন্মাদ হ'য়ে গেলুম। ফল হল এই, যে আমি তাকে যা তা বলে ভয়ানক গালাগাল দিলুম, সেও আমায় যা তা গালাগাল দিতে একটুও ত্রুটি করলে না।

"আমাদের দাম্পত্য জীবনের এই প্রথম কলহের যে ছাপ আমার মনে লেগে রইল তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, সে অতি ভয়ানক। আমি এটাকে কলহ বলচি বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এটা কলহ নয়, আমাদের দুজনের মধ্যে ব্যবধানের যে অতল স্পর্শ সমুদ্র আছে তারই আবিষ্কার। আমাদের মধ্যে যে ভালবাসা, যদি তাকে ভালবাসাই বলা যায়, তা এরই মধ্যে নিঃশেষে ফুরিয়ে গিয়েছিল, কাজেই ভালবাসা দিলে যে সম্পর্ক থাকে তাই নিয়েই আমরা এক জন আর একজনের সামনে তখন দাঁড়িয়েচি। দুজনেই আমরা আত্মাভিমানী, দুজনেই দুজনের সম্পূর্ণ অপরিচিত। এই হল আমার ও আমার স্ত্রীর বিবাহিত জীবনের প্রথম অধ্যায়।

"এই ঝগড়াকে তখন সোজা ঝগড়া বলেই মনে করেছিলুম, তখনও বুঝ্‌তে পারি নি যে এটা আর কিছুই নয়, শুধু আমাদের ভেতরের ব্যবধান। এই যে বিদ্বেষ ভাব, এই ছলা আর বিতৃষ্ণা—এই হল আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ। এই বুদ্ধিটুকু আমাদের মাথায় আসেনি বলেই কিছুদিন পরে মনের এই ভাবটা চাপা দিলুম। আগুন শুধু ছাই চাপাই রইল। দুজনেই আবার হেসে গল্প করে দিন কাটাতে লাগলুম। ভাবলুম শুধু ঝগড়া হয়েছে বইত নয়, তা এরকম হয়েই থাকে, যাক্ আর এমনটি হবে না, হতেও দেব না।

"কিন্তু আমাদের 'মধুচন্দ্রের' একমাস কাটতে না কাটতেই আবার

একপালা আরম্ভ হল। আমি ভাবলুম এরকম স্ত্রী দিয়ে আমার কোনও দরকার নেই, আর আমার স্ত্রীও ভাবলে এ রকম স্বামীকে দিয়ে তার কোনও দরকার নেই। এই দ্বিতীয় বারের ঝগড়ায় প্রথম বারের চেয়েও একটা গভীরতর ছাপ আমার মনে বসে গেল। ভাবলুম এ ঝগড়াকেত আর আকস্মিক ব্যাপার বলা যায় না। এ যে হঠাৎ একদিন ঝগড়া হয়ে গেল তাত নয়। এর মূলে আছে একটা বিশেষ অভাব, এবং সেই অভাবের জন্যই আবারও এই রকমের ঝগড়া হবেই। এবারে ঝগড়ার যে কারণ আমার স্ত্রী দেখিয়েছিল তা নিতান্তই হাস্যকর। যে টাকা ব্যয় করতে আমি কখনো অনিচ্ছা বা অসন্তোষ প্রকাশ করিনি, বিশেষতঃ আমার বেলায়, সেই টাকা ব্যয় করাই হল তার ঝগড়া করবার একটা ছল মাত্র। আমার মনে আছে একটা কথার এমন এক অদ্ভুত ব্যাখ্যা করে সে আমায় বুঝিয়ে দিয়েছিল যে টাকার জন্য আমি তার উপরে অত্যন্ত অন্যায় কর্তৃত্ব করি এবং টাকার ওপর শুধু আমারই অধিকার আছে—তার নেই।

"ন্যাকামি দেখে আমার মেজাজ অত্যন্ত গরম হয়ে গেল। আমি তাকে ভয়ানক গালাগাল দিলুম, সেও আমায় খুবই গালাগাল দিলে। আমার মেজাজ যতই গরম লাগ্‌ল তার মেজাজ ততই গরম হতে লাগ্‌ল। তার নাকে, মুখে, চোখে সেই ভীষণ বিদ্বেষ, দারুণ ঘৃণা আর নিষ্ঠুরতা যেন জ্বল্‌জ্বল্ কচ্ছিল। আমার অন্তরের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত যেন হিম হয়ে গেল।

"বাড়ীতে বাবা, মা ও ভাইয়ের সঙ্গে ত কতবার ঝগড়া হয়েচে, কিন্তু তাতে কখনো এমনতর ঘৃণা বিদ্বেষের সৃষ্টি হয় নি, এমন ভীষণ বিষও তাতে কখনো বেরোয় নি। যাই-হোক্, কিছু দিন কেটে গেল। দুজনের মনের ভাব গোপন রাখলুম, মুখে আমাদের 'ভালবাসা' জন্মাল,

অর্থাৎ ঘোর প্রবঞ্চনা আরম্ভ হল। কয়েক দিনের ভেতরেই মনটাকে আবার বোঝালুম হয়ত দু' দুবারই শুধু ভুল বোঝবার ফলে, বুদ্ধির ত্রুটিতে ঝগড়া হয়ে গেচে। এ ভুল শোধরানো যেতে পারে। এই রকম ভেবে অনেক সময়েই মনটাকে সান্ত্বনা দিতুম। কিন্তু যখন এর পরেও দু'দুবার ঝগড়া হয়ে গেল তখন আমার সমস্ত ভ্রমই দূর হয়ে গেল। স্পষ্টই বুঝ্‌লুম এটা ভুলও নয়, বুদ্ধির ত্রুটিও নয়, এ একটা বিশেষ অভাব, একটা বিশেষ প্রয়োজনের পরিণাম; কিছুতেই এর অন্যথা হতে পারে না, কাজেই এরকম কাণ্ড বারেবারেই ঘট্‌বে।

"একটা অশান্তির আশঙ্কায় আমার সর্ব্বশরীর যেন অবশ হয়ে গেল। মনে যে কি একটা বেদনা বোধ করলুম তা আর বলবার নয়। স্ত্রীর সঙ্গে কত সুখে, কত আনন্দে দিন কাটাবার সব রঙীন কল্পনা কোথায় গেল! আমার দুঃখটা একেবারে অসহনীয় হয়েছিল, কারণ তখনও আমার ধারণা ছিল যে, হতভাগ্য আমিই কেবল স্ত্রীর সঙ্গে ঘোর অশান্তিতে দিন কাটাচ্ছি, এ দুরবস্থা আর কারু হয় না, অন্যেত সুখেই দিন কাটাচ্ছে। তখনও আমি জানি নি যে শুধু আমার বরাৎটাই ওরকম নয়, বরাতের এই দোষ-টুকু প্রায় সকলেরই আছে। তারা সেটাকে নিজেদের কাছে গোপন রাখে—এই পর্য্যন্ত, বাইরের কোন লোককে জানতে দেয় না।

"আমাদের বিয়ের পরই এই অশান্তি আরম্ভ হল, এবং যতই দিন যেতে লাগ্‌ল ততই এই বিদ্বেষের আগুন বেড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। সমস্তটা মন দারুণ তিক্ততায় ভরে উঠ্‌ল। বিয়ের পর প্রথম কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মনে হল আমি ফাঁদে পা দিয়েচি। যার কল্পনায় মন সুখের নেশায় রঙীন হয়ে যেত, দশ জনের দেখে যে সুখের আশায় ক্ষিপ্ত হয়ে ছিলুম বাস্তব জীবনে দেখলুম তা একটা বিষম ভ্রম। সুখের পরিবর্ত্তে

এ এমন একটা যন্ত্রণার বোঝা হল যে তা আর বইতে পারা যায় না। অন্য সকলের মতই আমিও অন্যের কাছে একথা স্বীকার করতুম না, নিজেও চাপ দিয়ে মনকে ফাঁকি দিতুম। আজকেও ব্যক্ত করতুম না যদি না এ ব্যাপার আমার জীবনে চিরদিনের মত শেষ হয়ে যেত।

"যখনই এই নিয়ে ভাবি আমি নিজেই বিস্মিত হয়ে যাই যে কি করে তখন অন্ধ হয়ে ছিলুম, ভেতরের প্রকৃত রূপটি দেখবার চোখ আমার তখন কোথায় ছিল। আমাদের প্রকৃত অবস্থা বোঝ্‌বার একটা নিশ্চিত লক্ষণ এই ছিল যে, আমাদের যত কিছু ঝগড়া হত তা অতি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে। ঝগড়ার বিষয় এতই তুচ্ছ ছিল যে শেষে আমরাই মনে করতে পারতুম না কি নিয়ে ঝগড়া বেধেছিল। অন্তরে পুষ্ট এই বিদ্বেষ ও ঘৃণাই হল ঝগড়ার কারণ, কিন্তু ঝগড়ার উপযুক্ত কোন একটা ওজর দেয়ার সূক্ষ্ম বিচার-শক্তি তখন ছিল না। কাজেই যা কিছু ওজর দেখানো হত তা নিতান্ত ছেলে মানুষেও দেখায় না। এর চেয়েও বেশী আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল আমাদের পুনর্মিলন। কখনো বা সামান্য দু'একটা কথা, কখনো দু একটা কৈফিয়ৎ, আবার কখনো বা দু'এক ফোঁটা চোখের জল দিয়েই আমাদের আবার মিলন হত। এ সব হত খুব কম, কিন্তু প্রায়ই যে ভাবে আমাদের মিলন হত তা এখনও মনে হলে মনটা ঘৃণা লজ্জা ও বিরক্তিতে ভরে ওঠে। দুজনেই দুজনকে খুব গালাগাল দেওয়ার পর দুজনেই চুপ চাপ, ব্যস্ একটি কথাও নেই। এই নিস্তব্ধতার পরেই আবার সেই চুম্বন ও আলিঙ্গন!"

১২

দুই জন যাত্রী আসিয়া আমাদের কামরায় ঢুকিল, এবং তাদের বসিবার জায়গা ঠিক করিবার জন্য এ-দিক ও-দিক করিতে লাগিল। পজ্‌নিশেফ্‌ চুপ করিলেন। যাত্রী দুই জন আমাদের কাছ থেকে সব চেয়ে দূরের বেঞ্চিতে বসিল। সব গোলমাল থামিয়া গেল। তখন তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে এতক্ষণ পরেও, যেখানে থামিয়াছিলেন ঠিক সেইখান থেকেই বলিতে লাগিলেন,—

"দেখুন ভালবাসা জিনিষটা, অর্থাৎ সাধারণতঃ আমরা যাকে ভালবাসা বলি, কল্পনায় ভারি সুন্দর, ভারি মিষ্টি, মানুষের একটা মস্ত আদর্শ, একটা উচ্চ বৃত্তি, কিন্তু কার্য্যতঃ এই ভালবাসার কথা বলতে গেলেই মনটা কি রকম বিরক্তিতে ভরে যায়। প্রকৃতি বিনা কারণে ভালবাসা জিনিষটি এরকম করেন নি। যদি ভালবাসা বিরক্তিকরই হয় তা হলে তা গোপন না রেখে সকলের সামনে বলাই ভাল। আমরাত তা করি না। আমরা প্রচার করে বেড়াই যে 'ভালবাসা' অতি উচ্চ জিনিষ, স্বর্গের বস্তু ইত্যাদি।

"আমি সবিস্ময়ে মনকে জিজ্ঞেস করেচি,—এই যে আমাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ বাসা বেঁধে আছে, এ কি করে হল? এর কারণটা কিন্তু দিনের আলোর মতই স্পষ্ট। প্রকৃতি আমাদের অন্তরের বিদ্বেষ দূর করতে চায়, এটা হচ্ছে তারই বিরুদ্ধে মানব প্রকৃতির প্রতিবাদ। আমাদের অন্তরের এই বিষ দেখে আমিত থ' হয়ে গিয়েছিলুম, কিন্তু উপায় ছিল না। ঘৃণা দূর করা অসম্ভব ছিল। কোন

কু-কর্ম্মের সহচরগণ একে অপরের প্রতি যে ভাব পোষণ করে এটাও ঠিক সেই রকমের।

"আপনি বোধ হয় ভাব্ছেন আমি অবান্তর কথা এনে ফেল্‌চি। কিন্তু এ কথাগুলো একেবারেই অবান্তর নয়। কি করে আমার স্ত্রীকে হত্যা করেছিলুম সেই কাহিনীই আপনার কাছে প্রকাশ কচ্ছি। আমার বিচারের সময় সকলে আমাকে জিজ্ঞেস্ কর্‌ত কি করে কি দিয়ে আমি স্ত্রীকে হত্যা করেচি। এত বড় বোকা তারা! তারা মনে করেচে যে, আমি সেই ৫ই অক্‌টোবর তারিখে ছুরি দিয়ে স্ত্রীকে হত্যা করেচি। তখন তাকে হত্যা করি নি, তার বহুপূর্ব্বেই করেছিলুম, এখনও তেমনি প্রায় সকল স্বামীই তাদের স্ত্রীদের হত্যা কচ্ছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে কি রকম?"

"পুরুষ পূর্ণমাত্রায় অসংযমী ও উচ্ছৃঙ্খল বলে নারীকেও অত্যন্ত হীন হতে হয়েচে, তার স্বাস্থ্য আর মনুষ্যত্ব সবই গেচে। তার দেবীত্ব আর নেই, তাকে হতে হয়েচে পিশাচী। তার এখন মাত্র দুটি উপায় আছে। প্রথম হচ্ছে, যখনই প্রয়োজন বলে মনে হবে তখনই ত চিরদিনের জন্য তার মা হওয়ার শক্তি বিনষ্ট করা। দ্বিতীয় উপায়ও প্রকৃতির নিয়ম সোজাসুজি ভঙ্গ করা। স্ত্রীলোককে একই সময়ে সন্তানের ধাত্রী, রক্ষয়িত্রী ও স্বামীরও উপভোগের পাত্রী হতে হয়। আমাদের সমাজে নারীদের যে এত হিষ্টিরিয়া, আর স্নায়ুবিক দৌর্ব্বল্য—এর কারণ হল এই। রাষিয়ার অবস্থাত এই, ইউরোপের অবস্থাও আলাদা নয়। অনেক বড় বড় ডাক্তারও ঠিক এই কথাই বলেন।

"একটু ভাব্‌লেই বুঝতে পারবেন যে নারীর মাতৃত্বের অবস্থা কত প্রয়োজনীয়, কত উচ্চ, কত মহৎ। যে সন্তান মানবের ধারা রক্ষা করে, যে সন্তান আমাদেরই প্রতিনিধি তার আগমনের পথ রোধ করা

হয় কেন? তাকে অঙ্কুরে নষ্ট করাও যা, মাতৃত্ব—নারীত্ব নষ্ট করাও তা। এত বড় পবিত্র জিনিষ কিসের জন্য নষ্ট করা হয়? এই সব সত্ত্বেও পুরুষরা নারীর স্বাধীনতা, নারীর অধিকার সম্বন্ধে কথা কয়! এরকম অহঙ্কারত রাক্ষসরাও করতে পারে, তারাও বন্দী ক'রে শুধু খাবার জন্যেই খাইয়ে দাইয়ে মোটা ক'রেও বন্দীদের স্বাধীনতা ও স্বাধিকারের কথা কইতে পারে।"

যা শুনিলাম সবই আমার কাছে একেবারে নুতন বলিয়া মনে হইল। এমন কথা পূর্ব্বে কখনো শুনি নাই। এই কথাগুলি আমার মনের উপরে একটা গভীর ছাপ মারিয়া দিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি করতে চান আপনি? আপনি স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটি ভাঙতে চান, কিন্তু এটা জানেনত যে মানুষ—"

আর আমাকে বলিতে হইল না। কথাটা শেষ করিবার পূর্ব্বেই তিনি অমনি বলিলেন, "হ্যাঁ, আমি জানি। বিজ্ঞানের অতি জঘন্য বাহন ডাক্তারদের প্রচারের এও একটা খুব প্রিয়বস্তু। আমারই যদি শক্তি থাকৃত তা হলে একটি কাজ করতুম। যে স্ত্রীলোক মানুষের পক্ষে অপরিহার্য্য সেই স্ত্রীলোকের দ্বারা যে সব কার্য্য সমাধা হতে পারে সেই সব কাজের ভার এই নিতান্ত ঘৃণিত জড়বাদীগুলোকে দিয়ে শান্তি দিতুম; দেখতুম এসম্বন্ধে এরা কি বলে। যে জিনিষটি নিতান্ত অপরিহার্য্য বলে মানুষের ধারণা জন্মানো যায়, মানুষও সেটিকে অপরিহার্য্য বলে মনে করবেই। ছেলেবেলা থেকে যদি একটা লোক এই শিক্ষা পায় যে মদ না হলে কিছুতেই চলে না, মদ তার অপরিহার্য্য হবেই। তেমনি যদি তার ধারণা বদ্ধমূল করে দেয়া যায় যে, তামাক চাই-ই চাই, আফিং জীবনরক্ষার পক্ষে একটা মস্ত উপাদান, তা হলে এই সব জিনিষই তার কাছে সম্পূর্ণ অপরিহার্য্য বলে মনে হবে এই কি

মনে করতে হবে যে মানুষের কি দরকার তা ভগবান জান্‌তেন না, এবং যেহেতু তিনি ডাক্তারদের উপদেশ নেন নি সেই জন্যই তিনি তাঁর কাজে বোকামির পরিচয় দিয়েচেন ?

"এ হচ্ছে পরস্পর বিরোধী দুইটি জিনিষের সমন্বয়ের সমস্যা। এ বড় শক্ত সমস্যা। এ অবস্থায় কি করা যেতে পারে ? যদি ডাক্তারের পরামর্শ শুনি তবে সমস্যা সহজ হবে! মানুষের সর্ব্বনাশ করেও তারাই উপদেষ্টা! প্রবঞ্চনা আর জুচ্চোরির জন্য যদি ওদের বিচার হত! এখন আর দেরী করবার সময় নেই, দেখ্‌তেই পাচ্ছেনত অবস্থাটা কি দাঁড়িয়েচে। মানুষ ক্ষেপে যায়, মাথা খুঁড়ে মরে! কি ঘোর অশান্তি! এ সবের কারণও এইত। এর অন্য কারণ আর কি থাকৃতে পারে ?"

"পশুও তার স্বাভাবিক বুদ্ধি দ্বারা বুঝ্‌তে পারে যে, তার বাচ্চা তারই জাতের ধারা বজায় রাখ্‌চে। পশুও সেই জন্য কতকগুলো নিয়ম মেনে চলে। মানুষই কেবল এটি জানেনা, জানতেও চায় না। সমস্ত মনুষ্য জাতির অর্দ্ধেকটা একেবারে নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে। যে নারী শান্তি, সুখ ও উন্নতির পথে পুরুষের প্রধান সহায়, যে সত্য শিব ও সুন্দরের জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে, সেই নারীই আজ হয়েচে সমস্ত সুখ, শান্তি, উন্নতি ও সৃষ্টির অন্তরায়—প্রধান শত্রু। নারীর ভেতরে এই হীন, এই নিতান্ত ঘৃণিত পরিবর্ত্তন এনেচেত পুরুষ। ভাল করে দেখুন দেখি মানবের উৎকর্ষও উন্নতিতে বাধা দিচ্ছে কে ? নারী। কেন সে অন্তরায় হল তার কারণ ত বলাই হল।"

তিনি তার সেই অতি পুরাতন ব্যাগটি খুলিয়া একটি চুরুট বাহির করিলেন। চুরুটটি ধরাইয়া টানিয়া তিনি যে তাঁর উত্তেজিত মনটা শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন তা খুব স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল।

চুরুটটি একেবারে শেষ করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "অন্যের মতই আমিও আমার জীবন কাটাচ্ছিলুম। অন্যের চেয়ে আমার অবস্থা আরও খারাপ ছিল এই জন্যে যে, আমি মনে করতুম আমার কোন দোষ নেই, অন্য কোন রমণীর সঙ্গে মিলনের ইচ্ছা আমার কোন দিনই ছিল না, পারিবারিক যতটা পবিত্র হতে পারে আমার জীবনও ততটা পবিত্রই ছিল, এবং আমার সংসারে অশান্তির মূল হচ্ছে—আমার স্ত্রী। তার চরিত্রই এই অশান্তির জন্য দায়ী, আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। অবশ্য এ কথা একেবারেই বাহুল্য যে প্রকৃত অপরাধ তার নয়। অপর দশজন স্ত্রীলোকও যেমন সেও তেমনি ছিল। সে যে আবহাওয়ায় পুষ্ট ও শিক্ষিত হয়েছিল, প্রায় সকল স্ত্রীলোক তেমনিভাবে পুষ্ট ও শিক্ষিত হয়, সুতরাং আমাদের এই সমাজের মেয়েরাও যা করে সেও তাই কচ্ছিল। আমাদের দেশের বড় লোকের মেয়েরা যেরকম শিক্ষা পেয়ে থাকে তার শিক্ষাও সেই রকমেরই ছিল।

"স্ত্রী শিক্ষার নতুন নতুন নিয়ম নিয়ে আজকাল বক্তৃতা করা একটা ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েচে। এই সব বক্তৃতা শুধুই প্রলাপ। নারীত্ব সম্বন্ধে যে ভাব—যে মত আমাদের সমাজে চল্‌চে সেই অনুসারেই মেয়েদের কার্য্যতঃ শিক্ষা দেয়া হচ্ছে এবং নারী সম্বন্ধে পুরুষের যা ধারণা সেই অনুসারেই চিরদিন নারীকে শিক্ষা দেয়া হবে। নারী-সম্বন্ধে পুরুষের কি ধারণা, নারীর প্রতি পুরুষের কি ভাব তা সকলেই জানে। অনেক কবিও গেয়ে থাকেন,—'মদ, মেয়ে মানুষ আর নাচ

গান।' যে কোন যুগের কাব্য পড়ুন, চিত্র এবং ভাস্কর্য্য দেখুন, আপনিই সর্ব্বত্রই দেখ্‌তে পাবেন—কি উচ্চশ্রেণীতে আর কি নিম্ন শ্রেণীতে, নারী শুধুই প্রমোদের জিনিষ, উপভোগের বস্তু।

"সয়তানী শুধু এখানেই শেষ হয়নি। পুরুষত নারীকে হীন করলেই, আবার তা নানান কৌশলে ঢেকে রাখ্‌তে চেষ্টা করলে। প্রাচীন কালেরও কত বীরের প্রণয়-কাহিনীতে পড়ি যে তাঁরাও নারীকে দেবী বলে সম্মান করতেন, পূজা করতেন। আমাদের সময়েও পুরুষরা ভাণ করে যে, তারা নারীকে সম্মান দেখায়, শ্রদ্ধা করে, নিজেরা উঠে তাকে আসন ছেড়ে দেয়, তার রুমাল কুড়িয়ে দেয়, তা ছাড়া দেশের বড় বড় দায়িত্বপূর্ণ পদেও তাকে বসাতে চায়, রাজনীতিতেও উচ্চ আসন দিতে চায়, এই রকম কত কি। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও নারীর মর্য্যাদা যা ছিল তাই আছে, তার সম্বন্ধে পুরুষের যে ধারণা ছিল তা বদলায় নি। নারী যে বিলাসের সামগ্রী ছিল ঠিক তাই আছে, সে নিজেও তা বেশ জানে।

"দাসত্ব সম্বন্ধেও লম্বা লম্বা বক্তৃতা হরদম্ শুনতে পাওয়া যায়, কিন্তু ব্যবহারে দেখ্‌তে পাই সব উল্টো। বহুলোকের বুকের রক্ত জল করা খাটুনির ফল মহা আনন্দে ভোগ করে খুব অল্প লোক। যতদিন না মানুষের প্রাণ দিয়ে খাটুনির ফল ভোগ করাকে মানুষ অন্যায় বলে মনে না করবে, যতদিন মানুষ এটাকে মনুষ্যত্বের পরিপন্থী বলে ত্যাগ না করবে ততদিন দাসত্বের শেষ কি করে হবে? একদিকে কুবেরত্ব আর একদিকে হীন দাসত্ব। কিন্তু কি করা হচ্ছে? আইন করে দাস-বিক্রয় প্রথা বন্ধ করেই দাসত্ব লোপ করবার উপায় করা হল! এ শুধু বাইরেকার খোলস নিয়ে টানাটানি। এ সত্ত্বেও লোকের বিশ্বাস যে দাসত্ব লোপ পেয়েচে, অথচ তারা ভেবে দেখে না যে দাসত্ব

যেমনি ছিল ঠিক তেমনি আছে। তাই তারা অন্যের প্রাণপাতের সুযোগ নিয়েও সৎকাজ কচ্ছে মনে করে। দাসত্বের যন্ত্রণা দূর করবার জন্যে কত ধূর্ত্ত সংস্কারকের আবির্ভাব হয়েচে, তাদের শুধু বাইরের চেহারাটি বদ্‌লে গেচে, মূল জিনিষটা বদলায় নি।

"নারীর অধীনতা সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই বলা চলে। স্ত্রীলোককে বিলাসের সামগ্রী করেও সকলে ভাবে তারা সৎ। এদিকে স্ত্রীলোককে এ-অধিকার সে-অধিকার দেয়া হচ্ছে পুরুষের সমস্ত অধিকারই হয়ত দেয়া গেল; তবুও পুরুষ তাকে বিলাসের সামগ্রী বলেই কার্য্যতঃ মনে কচ্ছে এবং তেমনি করেই তাকে শিক্ষা-দীক্ষা দিচ্ছে। বাইরের দিকেই সকলের ঝোঁক, ভেতরের দিকে কোন দৃষ্টিই নেই। যতই তার স্বাধীনতার জন্য চেঁচাও না কেন, তাকে যত স্বাধীন শিক্ষাই দাও না কেন, আর যত বড় বড় স্কুল কলেজ ও বোর্ডিং তার জন্য করনা কেন, যত দিন না পুরুষের মনের ভাব বদ্‌লাচ্ছে এবং নারীদের নিজের সম্বন্ধে যে ধারণা বদ্ধমূল হয়ে রয়েচে তার পরিবর্ত্তন না হচ্ছে ততদিন প্রকৃত স্বাধীনতা প্রকৃত উন্নতি অসম্ভব। পূর্ণ জড়বাদ নিয়ে, পশুত্ব নিয়ে স্বাধীনতা হয় না। নির্ব্বাচনে ভোট দিলেই কি প্রকৃত উন্নতি হ'ল মনে করতে হবে? আধুনিক ভাবের পরিবর্ত্তন না হলে নারী যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায়ই থাকবে তার শিক্ষা যত উচ্চই হোক না কেন; অর্থাৎ যত পুরুষকে পারে সে ভোলাতে চেষ্টা করবে, তার পশুত্ব কম্‌বে না। গণিতে বিজ্ঞানে পারদর্শিণী কিংবা সঙ্গীতে অদ্বিতীয়া বা কাব্যে অতুলনীয়াই হোক না কেন কিছুই তাতে এসে যায় না। নারী তখনই সুখী হয় যখন সে পুরুষকে মুগ্ধ করতে পারে, বশীভূত ক'রে রাখ্‌তে পারে। কাজেই সে এই বিদ্যেটাই ভাল করে আয়ত্ত করে। চিরদিনই এই হয়ে এসেচে আরও হবে। বিয়ে হওয়ার

পূর্ব্বেও আমাদের সমাজের মেয়েদের এই ভাব থাকে, বিয়ে হলেও এ ব্যারাম তাদের যায় না। কুমারীর কাছে এটা বিশেষ দরকারী, কারণ তাকে বহুলোকের ভেতর থেকে স্বামী বাছাই করে নিতে হয়। আর বিবাহিতার পক্ষেও দরকার কারণ তা হলেই সে স্বামীর উপর জোর কর্ত্তৃত্ব চালাতে পারে। একমাত্র জিনিষ নারীর এই ভাবটি নষ্ট কর্‌তে পারে, সেটা হচ্ছে তার মাতৃত্ব। ছেলে মেয়ে হলে নারী অনেকটা শোধরায়। কিন্তু মা যদি রাক্ষসী হয়, সে যদি নিজের সন্তান নিজে লালন পালন না করে তা হলে সে পূর্ব্বেও যা থাকে পরেও তা-ই থাকে। এ বিষয়েও ডাক্তারদের মত অন্য রকম।

"আমার স্ত্রীর দু-একটি নয় পাঁচ পাঁচটি ছেলে মেয়ে। সে নিজেই তাদের যত্ন কর্‌ত, মাই খাওয়াত। প্রথম সন্তান হওয়ার পরেই তার অসুখ হল। টাকা খরচ করে ডাক্তার ডাক্‌লুম। ডাক্তার এসে তাকে ভাল রকম পরীক্ষা করে বল্‌লেন যে, আমার স্ত্রী তার সন্তানকে মাই খাওয়াতে পারবে না। ডাক্তারের এই উপদেশের ফলে হ'ল এই যে, ছেলে বুকে ক'রে মাই খাইয়ে তার অন্য কুচিন্তা, অন্য পুরুষের দিকে নজর দেয়া যেটুকু বন্ধ হতে পারত, সে যদি বা ভাল হতে পারত, তা আর হল না। আমরা একজন ধাই রাখ্‌লুম। এই ধাইটি খুব গরীব ছিল বলে সে নিজের ছেলেকে ফেলে রেখে আমাদের ছেলে প্রতিপালন করতে লাগ্‌ল। তার দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে ছেলে কোলে রাখবার আনন্দ থেকে তাকে বঞ্চিত করা হল। ছেলে পালন করা, ছেলেকে অনবরত দেখা, ইত্যাদি সব কাজ-থেকে খালাস পেয়ে আমার স্ত্রীর অলস মনে আবার কুচিন্তা বাসা বাঁধতে লাগ্‌ল। ঈর্ষ্যা ও অশান্তিতে আমি জ্বলে পুড়ে মচ্ছিলুম। এক মুহূর্ত্তও আমার আর শান্তি ছিল না। বিয়ের পর থেকেই এই অশান্তি আরম্ভ হ'য়েছিল বটে, কিন্তু এখন

একেবারেই অসহ্য হয়ে পড়ল। আমি স্ত্রী নিয়ে যেরকম ভাবে ঘর কচ্ছিলুম সেরকম ভাবে যেসব স্বামী তাদের স্ত্রী নিয়ে ঘর করে তাদের সকলেরই বরাৎ ঠিক এই। এযে বিশেষ ভাবে আমারই হয়েছিল তা নয়।"

১৪

একটি চুরুট ধরাইয়া নিঃশেষ করিয়া তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, "আমার বিবাহিত জীবনে বিদ্বেষের জ্বালা থেকে এক মুহূর্ত্তও আমি নিষ্কৃতি পাইনিত এক এক সময়ে সে জ্বালা অসহ্য রকমের তীব্র বোধ হত। আমার প্রথম সন্তান হওয়ার পর ডাক্তাররা আমার স্ত্রীকে বল্‌লেন যে সে যেন নিজের হাতে তার সন্তান পালন না করে। সেই সময় থেকেই আমার এ অবস্থা আরম্ভ হল।

"ঈর্ষ্যা বাড়বার কারণও ছিল। মা হয়ে যে তার নিজের রক্তে গড়া সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য অনায়াসে অতি লঘু চিত্তে ত্যাগ করতে পারে, তার দ্বারা স্ত্রীর কর্ত্তব্য সম্পন্ন হতেই পারে না। আমার স্ত্রীর স্বাস্থ্য খুব ভালই ছিল। তবুও নিজের সন্তানকে অন্যের কাছে দিতেও সে কোন কষ্টই বোধ করলে না। এই স্নেহের বন্ধন, নৈতিক বন্ধন সে মান্‌লে না দেখে, আমি স্বভাবতই ভাবলুম—সে আরও সহজে স্ত্রীর কর্ত্তব্য ধুয়ে মুছে ফেল্‌তে পারে। স্বামীর প্রতি তার আবার একটা কর্ত্তব্য কি? পরে দেখেছি ডাক্তারদের বারণ সত্ত্বেও অন্য ছেলেপুলেদের সে মাই খাওয়াত এবং তাতে কোন কষ্ট বা অসুবিধা বোধ করত না।"

তাঁর মুখের বিকৃতভাব, কণ্ঠস্বরের তীব্রতা দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা

করিলাম, "আপনার কথায় মনে হয় আপনি ডাক্তারগুলোকে দেখ্‌তে পারেন না।

তিনি বলিলেন, "দেখতে পারা না পারার কোন কথা নয়। আমার জীবনটা একেবারেই নষ্ট করে দিয়েচে এই ডাক্তাররা, এমনি করে হাজার হাজার লাখ লাখ লোকের জীবনও তারা নষ্ট কচ্ছে। আমি এই টুকুই শুধু বল্‌চি। উকীল বা অন্য ব্যাবসায়ীদের মত ডাক্তারদের পক্ষেও এটা খুবই স্বাভাবিক যে তারা শুধু টাকা আয় করবার জন্যই ব্যস্ত, তা যে কোন রকমেই হোক্‌ না। টাকাই তাদের সব চেয়ে বড় লক্ষ্য, আর অন্যায়কে, পাপকে তারা ভয় করে না। আমার বার্ষিক আয়ের অন্ততঃ অর্দ্ধেকটা খুব আনন্দের সহিত ডাক্তারদের দিতে আমি রাজী আছি, বোধহয় আরও অনেকেই দিতে রাজী হবেন, যদি ডাক্তাররা এই সর্ত্তে আবদ্ধ থাকেন যে অমঙ্গল তারা যা করেন, নৈতিক হীনতায় তারা যে সাহায্য করেন, তা লোককে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবেন, কারুর পারিবারিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ্‌ করবেন না, অন্যের সুখ ও শান্তি নষ্ট করে দেবেন না। ঠিক সংখ্যা অবশ্যি জানিনে তবে অনেক ঘটনা জানি যে তারা গর্ভস্থ সন্তান হত্যা করেন, কখনো বা অস্ত্রোপচারের ওজরে অনেক মাকেও মেরে ফেলেন। এসব হত্যাকাণ্ড নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কত নৈতিকহীনতার অপরাধে ডাক্তাররা অপরাধী, তার সংখ্যা করা যায় না। যে পৈশাচিক চরিত্রহীনতা, জড়বাদের যে ঘৃণিত উপাসনা তাঁরা নারীদের দ্বারা করান তার তুলনায় এই সব অপরাধ কিছুই নয়। ডাক্তারের উপদেশ শুন্‌লে আর ত রক্ষে নেই। ওঁদের উপদেশ হচ্ছে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করবার উপদেশ, মিলনের উপদেশ নয়। ওঁদের কথা শুন্‌লে একপা চলবার জো নেই। কারু সঙ্গে মেশবার উপায়

নেই, সর্ব্বত্রই নানান ব্যাধির ভীষণ বীজাণু। ডাক্তারের উপদেশ শুনলে শুধু নিজের জায়গাটিতে বসে থাকতে হবে, আর অন্য স্থান থেকে অন্যের দেহ থেকে জীবাণু এসে যাতে নিজের দেহে সংক্রামিত না হয় এজন্য পিচকারীতে অষুধ পূরে সঙ্গে সঙ্গেই রাখ্‌তে হবে।

"যাক্ এ যা বল্‌লুম এ শুধু আনুষাঙ্গিক। তাঁদের দ্বারা প্রকৃত অনিষ্টই হচ্ছে এই নৈতিকচরিত্র নষ্ট করা, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের। আজকাল যদি কাউকে বলা যায়,—'ভাই, অত্যন্ত অন্যায় এবং অসৎ ভাবে জীবন কাটাচ্ছ, ভাল হবার চেষ্টা কর,'—তা হলে তা নিতান্ত অসঙ্গত হবে। সদুপদেশ কেউ দেয় না, সৎপথে চালাবার চেষ্টাত কেউ করে না। আপনার জীবন হয়ত অত্যন্ত কলুষিত, ডাক্তার দেখ্‌লেন আপনার স্নায়ু, বল্‌লেন 'স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য'। স্নায়ুকেন্দ্রে গোলযোগ হওয়াই ব্যারামের কারণ স্থির করে বোতল বোতল ওষুধ দিতে লাগলেন, আর আপনিও টাকা দিতে লাগ্‌লেন। এই রকম করে আপনার অবস্থা আরও খারাপ হল, সুতরাং আপনার আরও ডাক্তার ও অষুধের দরকার হল। মনের বিষ ত কেউ দূর করে না। চমৎকার ব্যবস্থা!

"যাক্ কথায় কথায় এত বলতে হল। আমি চেয়েছিলুম যে আমার স্ত্রী নিজেই তার সন্তানদের মাই খাওয়াবে, যত্ন করবে, দেখ্‌বে শুনবে; আর সেও সমস্ত ভারই নিয়েছিল। এর ফলও খুব ভালই হয়েছিল, যে ঈর্ষ্যার জ্বালায় আমি জ্বল্‌ছিলুম তা কমে গিয়েছিল। আমার স্ত্রীরও স্বভাবের ঢের পরিবর্ত্তন হয়েছিল। কারণ পূর্ব্বে সে ছিল শুধু স্ত্রী, এখন সে স্ত্রীও বটে মাও বটে। এ না হলে বহু পূর্ব্বেই দুর্ঘটনাটি হ'ত। সন্তানগুলি তাকে এবং আমাকে রক্ষা করে রেখেছিল। আট বছরে তার পাঁচটি সন্তান জন্মেছিল।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার ছেলে মেয়েরা এখন কোথায় ?"

তাঁর মুখের চেহারাটা যেন কি রকম হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "ছেলে মেয়ে ?"

তাঁর ভাব দেখিয়া মনে হইল হয়ত তাঁকে জিজ্ঞাসা করা ভাল হয় নাই। হয়ত তাঁর মনে ইহাতে কত দুঃখের স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছে, কত দিনের কত চাপা দীর্ঘশ্বাস সমস্ত বাঁধ ভাঙিয়া বাহির হইয়া পড়িবে। তাই আমি বলিলাম "আমি না জেনে আপনার অনেক দুঃখ ও বেদনার কথা মনে পড়িয়ে দিয়েচি। আমায় ক্ষমা করুন।"

"না, না, এ কিছুই নয়। আমার শ্যালক আর শ্যালিকাই ছেলে মেয়েদের ভার নিয়েছে। আমার সম্পত্তি যাদের দিয়েছিলুম, ছেলেমেয়েদের আমার কাছে থাকতে তারাই দিলে না। দেখ্‌তেই পাচ্ছেনত আর একরকমের পাগল। ছেলে মেয়েদের ছেড়ে দূরে চলে যাচ্ছি। আমি তাদের আন্‌তে গিয়েছিলুম কিন্তু আমার শালী তাদের আন্‌তে দিলে না। যদি তাদের কাছে রাখ্‌তে পার্‌তুম তা হলে তাদের এমন শিক্ষা দিতুম যে তারা আর তাদের বাপ মায়ের মতন না হয়। কিন্তু এই শিক্ষা কেউই চায় না, এইটিই হল মজা। আমরা যেমন ছিলুম তাদেরও তেমনি হওয়া উচিত, এই রকমই সকলে মনে করে। কি আর করব, এর কোন উপায় নেই। আমাকে অবিশ্বাস করা এবং আমার কাছ থেকে ছেলেমেয়ের কেড়ে নেয়া তাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। তা ছাড়া তাদের শিক্ষা দেয়ার মত উৎসাহ ও শক্তি যে আমার আছে তাও নিশ্চয় করে বলতে পারি নে। আমি ভেঙে গেচি, আমিত এখন পঙ্গু। যাই হোক্ এটা খুবই সত্যি যে, আমি যা জেনেচি অধিকাংশ লোকেই তা খুব শীঘ্রই জান্‌তে পারবে। দুঃখ এইটুকু যে চার দিকের অসভ্যদের মতই আমার ছেলে

মেয়েরা বড হচ্ছে। আমি তিনবার তাদের দেখ্‌তে গেচি কিন্তু কিছুই করতে পারিনি। দক্ষিণদিকে অনেক দূরে আমার একটি ছোট বাড়ী ও বাগান আছে, আমি এখন সেইখানেই যাচ্ছি। আমি যা জেনেচি ও শিখেচি, তা জান্‌তে ও শিখ্‌তে লোকের এখনও কিছুদিন কেটে যাবে। সূর্য্যের মধ্যে লোহা আছে কিনা, নক্ষত্রের ভিতরে কি কি ধাতু আছে তা নির্ণয় করা বরং সহজ, কিন্তু বীভৎস দুর্নীতির অপরাধে আমরা কেন অপরাধী হই তা নির্ণয় করা ভয়ানক শক্ত। আপনি দয়া করে আমার কথাগুলো শুন্‌চেন আমি সেজন্য আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।"

১৫

একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া তিনি বলিলেন, আপনি এই মাত্র আমার ছেলেমেয়ের কথা উল্লেখ করেচেন; একবার ভেবে দেখুন এই শিশুদের সম্বন্ধে কি মিথ্যা কথাই প্রচার করা হয়। শিশু ভগবানেরই আশীর্ব্বাদ, শিশু ভোলানাথ গৃহের আনন্দ। এক সময়ে এটা খুবই সত্য ছিল, কিন্তু আজকাল এটি একেবারেই মিছে কথা। আজকাল অনেক মা-ই মনে করেন সন্তান একটা যন্ত্রণা বিশেষ, একথা তাঁরা স্পষ্ট করে বলেও থাকেন। আমাদের এই সমাজের সাধারণ স্ত্রীলোকদের জিজ্ঞেস্‌ করে দেখুন, বিশেষতঃ যাদের খুব ঐশ্বর্য্য আছে তারা আপনাকে বুঝিয়ে দেবে যে, পাছে ছেলের অসুখ হয়, পাছে সে মারা যায় এই ভয়েই তারা সন্তান চায় না। না চাওয়া সত্ত্বেও যদি কোন শিশুর আবির্ভাব হয়, তা হলেও মা হয়ে তারা শিশুকে মাই দেয় না, যত্ন করে না। তাদের ভয় পাছে সন্তানের প্রতি যদি তাদের

স্নেহ-মমতা বেড়ে যায় তা হলেইত সকল আমোদ-প্রমোদ, সব স্ফূর্ত্তি একেবারে মাটি। শিশুর সেই কচি কচি কোমল হাতপা, মাখনের মত স্নিগ্ধ কমনীয় তার ক্ষুদ্র দেহটি, গোলাপের মতই সুন্দর তার গাল ছুটি—এই সব ভেবে তারা যে আনন্দ পায় তার চেয়ে কষ্ট পায় ঢের বেশী। সে কষ্টটা কি? সন্তানের ব্যারাম বা মৃত্যু নয়, ব্যারাম বা মৃত্যুহওয়ার সম্ভাবনা মাত্র। একদিকে এই অসুবিধা, আর একদিকে নিশ্চিন্তচিত্তে আমোদ-প্রমোদ। এই দুইয়ের ভেতরে তারা আমোদ-প্রমোদ ও বিলাসের পক্ষপাতী হয়ে তৎক্ষণাৎ স্থির করে যে, সন্তান হওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়। নির্ভয়ে স্পষ্টভাবেই তারা বলে যে সন্তানের প্রতি ভালবাসার জন্যই তারা সন্তান চায় না। কিন্তু এই যুক্তি দিয়ে তারা যে ভালবাসা অস্বীকার কচ্ছে, আর শুধু নিজেদের সুখ, বিলাস এবং স্বার্থপরতাই প্রকাশ কচ্ছে এটুকু তারা দেখে না। অবারিত স্ফূর্ত্তি ও বিলাসে যদি কোন অসুবিধা হয়,—সন্তানের ভালবাসায় যদিই আবদ্ধ হতে হয়, এই ভয়েই তারা সন্তান চায় না। সন্তানের জন্য তারা কিছুমাত্র ত্যাগ করতে রাজী নয়, নিজেদের সুখ সুবিধা অবারিত রাখবার জন্য তারা সন্তানকেই বলি দেয়, তাকে পৃথিবীতে আস্‌তে দেয় না। একি ভালবাসা, একি মাতৃ-স্নেহ, না মাতৃভাব। এর চেয়ে হীন স্বার্থপরতা আর নৈতিক হীনতা মানুষের কি হতে পারে?

"বিবাহের পর প্রথম কয়েক বছর ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে আমাদের তিন চারটে ছেলেমেয়ের জন্য আমার স্ত্রী যা কষ্ট সহ্য করেছিল তা মনে হলে শিউরে উঠ্‌তে হয়। আমাদের তখনকার জীবন ত ছিল পশুর জীবন। একে মানুষের জীবন বলা চলে না। আমাদের বিপদ যা ছিল তা বাইরের নয়, ভেতরের, অন্তরের। ডুবু ডুবু জাহাজের যাত্রীদের মতই আমাদের অবস্থা হয়েছিল। কোন

কোন সময়ে মনে করতুম যে ছেলেমেয়েদের জন্য এত উদ্বেগ প্রকাশ করা আমার স্ত্রীর একটা ছল মাত্র, এ শুধু আমার হাত থেকে সর্ব্ববিষয়ের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব কেড়ে নেয়ার চেষ্টা। যাইহোক সাময়িক ভাবে ছেলেমেয়ের মুখ চেয়ে তাদেরি মায়ায় স্ত্রীর অনুকুলেই মনে মনে সায় দিয়ে চুপ করে থাক্‌তুম। তার মাতৃস্নেহও আমার কাছে ভণ্ডামী বলে মনে হত। প্রকৃতপক্ষে কি তা নয়। সত্যই সে তার সন্তানের চিন্তায় সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন থাকৃত, সন্তান বাঁচাবার জন্যই সমস্ত সময়টা সে ব্যয় করৃত। ছেলেমেয়ের শরীরটা কেমন আছে, কোন অসুখ হল কি না, কি খেলে না খেলে, ঘুমুল কি না—এই সব নিয়েই সে মাথা ঘামাত, নিজের সমস্ত স্বাস্থ্য ও শান্তি নষ্ট করতে বসেছিল। ছেলে মেয়েকে সে বড়ই ভালবাসৃত। অসাধারণ মাতৃস্নেহ যেমন হয়ে থাকে তারও ঠিক তা-ই হয়েছিল। কিন্তু ইতর জন্তুর মত কল্পনা, আর যুক্তি থেকে সেও অব্যাহতি পেলেনা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যাক্—মুরগী। তার বাচ্ছার ভবিষ্যৎ কি হবে, কি কি হলে কোন্ কোন্ ব্যারাম হওয়ার সম্ভাবনা, কি করলে সে ব্যারাম আবার ভালও হতে পারে—এসব ভাবনা তার নেই। বাচ্ছাটা তার কাছে বিরক্তির কারণও নয়। তার স্বভাব তাকে দিয়ে যা করায় বাচ্ছার জন্য সে তাই করে, সুতরাং বাচ্ছাটাকে সে যে একটা পরম আদর ও আনন্দের বস্তু মনে করে এ ত স্বাভাবিক। যদি বাচ্ছাটার নেহাৎ অসুখই হয় তা হলে তাকে তা দেয়, খাওয়ায়, বাস্, তার কর্ত্তব্য শেষ হ'ল বলেই সে মনে করে। যদি বাচ্ছা মারা যায় সে জান্‌তেও চায়না কেন মারা গেল, কোথায় গেল ; শুধু খানিকক্ষণ ডাকে, কষ্টও বোধ করে, তারপর যথাপূর্ব্বং তথা পরং।

"কিন্তু স্ত্রীলোকের, বিশেষতঃ আমার স্ত্রীর অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত।

ছেলেমেয়ের অসুখ এবং চিকিৎসা ছাড়াও আরও অনেক বিষয় আছে যা নিয়ে এদের মাথা ঘামাতে হয়, যেমন পোষাকপরিচ্ছদ, শিক্ষা, খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি। ছেলেমেয়েকে খাওয়ানো, দাওয়ানো, ঘুমানো চালানোর জন্য আমরা কি হপ্তাতেই নতুন নতুন নিয়ম করতুম। ছেলেমেয়ে নিয়ে আমার স্ত্রী এমন করত যেন তারা এই কালকে জন্মেচে। কখনো কোন ছেলের অসুখ হলে সে নিজেকেই সেই জন্য দোষী মনে করত, কেবল ভাবত কেন সে আগে সাবধান হয় নি, যা করা উচিত ছিল সে কেন তা করে নি।

"কাজেই যখন ছেলেগুলোর স্বাস্থ্য মোটের ওপর ভালই, তখনই যদি তারা উদ্বেগের কারণ হয়, তা হলে যখন তাদের ব্যারাম হয় তখনও সংসার দারুণ যন্ত্রণার স্থান বলেই মনে হয়। আমরা এটা স্বতঃসিদ্ধ বলেই মেনে নেই যে ব্যাধির সম্পূর্ণ উপশম হয়, একরকমের বিজ্ঞান আছে যার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ব্যাধির প্রতিকার, আর কতকলোক আছে, যারা এই প্রতিকার জানে, তাদেরই বলা হয় ডাক্তার। সব ডাক্তারই যে রোগ ভাল করতে পারেন তা নয়, তবে যাঁরা সব চেয়ে নামজাদা তাঁরা পারেন। ছেলের ব্যারাম হলে সব চেয়ে বড় সমস্যা হয় এই যে, কি করে সব চেয়ে বড় ডাক্তার পাওয়া যাবে।

তাঁকে পেলেই ছেলে বাঁচবে, আর যদি তাঁকে না পাওয়া যায়, যদি তাঁর বাড়ী দূরে হয়, তা হ'লে আর ছেলেকে বাঁচানো গেল না। এ যে কেবল আমার স্ত্রীর বিশ্বাস তা নয়, তার মত সব স্ত্রীলোকেরই এই বিশ্বাস। আমার স্ত্রী প্রায়ই অন্য স্ত্রীলোকের কাছে শোন্‌তে পেত, "অমুকের স্ত্রীর তিন তিনটে ছেলে মারা গেল গো, আহা হা! মারা যাবে নাত কি! ডাক্তারকে আনবার জন্য কি আর আগে চেষ্টা হয়েছিল? তা হলে কি আর মারা যেত? ডাক্তার—অমুকের বড়

মেয়েটাকে কি সাংঘাতিক ব্যারাম থেকেই বাঁচালে। ডাক্তারের কথায় তারা কত জায়গায় ঘুরে ঘুরে তবে রক্ষে পেল। যারা যায়নি তাদেরই ছেলে মারা গেল। অমুকের মেয়েটা কি রোগাই ছিল! ডাক্তার হাওয়া বদলাতে বল্‌লে। হাওয়া বদ্‌লে মেয়েটা বাঁচ্‌ল। এখন ত সে দিব্যি ফুটফুটে সুন্দর।" এই অবস্থায় ডাক্তার—কি বল্‌চেন তাই যথাযথ ভাবে পালন করার ওপরই তার সন্তানদের জীবন সম্পূর্ণ নির্ভর কচ্ছে ভেবে সন্তান রক্ষা করবার জন্যে যে আমার স্ত্রী এত কষ্ট করেচে, তা কিছুই বিচিত্র নয়। সে না ক'রে পারে কি? কিন্তু ডাক্তার—যে কি বল্‌বেন তা অন্যেও জান্‌ত না, আর ডাক্তার নিজেও জান্‌ত না। সে শুধু এই চেষ্টা করে যে লোকে তার কথায় বিশ্বাস না হারায়।

যদি আমার স্ত্রী একেবারে একটি জন্তু হত, তা হলে আর তার এত কষ্ট করবার দরকার থাক্‌ত না। সে যদি খাঁটি মানুষ হত, তা হলে তার অন্তরে ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস থাকত, এবং অশিক্ষিত সরলপ্রাণ কৃষকরমণীর মতই বল্‌তে পারত—'ভগবান দিয়েছিলেন, তাঁর জিনিষ তিনিই আবার নিয়েচেন। এতে মানুষের কোন হাত নেই, এ শুধু ভগবানের ইচ্ছা; তা হলে সে জান্‌ত এবং বুঝ্‌তে পার্‌তে যে, দুনিয়ার সমস্ত মানুষের জীবন ও মরণ এবং তার নিজের সন্তানের জীবন ও মরণে মানুষের কোন হাত নেই, এ শুধু ভগবানের হাত। এইটুকু জানলেই তার সন্তানদের রোগ ও মৃত্যু বন্ধ করায় তার শক্তি আছে, এ ভাবনা নিয়ে সে মাথা ঘামাত না। সে তা বোঝে নি। কচি কচি ঐ শিশুদের সমস্ত ভার তার ওপরেই আছে, এই টুকুই সে জানে; তাই সে তাদের রাখ্‌তে চায় নিখুঁত করে, সুন্দর ক'রে, অথচ সে তার উপায় জানে না। জানে সে যে তার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং যার

উপদেশে রাশি রাশি টাকা না দিলে তার জানবার জো নেই। এতে বিরক্ত না হয়ে এবং মানসিক যন্ত্রণা ভোগ না ক'রে সে পারবে কেন?

"ঝগড়া ঝাঁটি হওয়ার পর, কিংবা আমার স্ত্রীর বিশেষ কোন অপরাধের নিদর্শন পাওয়ার পরেও আবার যখন রাগ কমে কমে ঠাণ্ডা হয়ে আস্‌ত, আবার যখন নতুন ভাবে জীবন আরম্ভ করবার উপক্রম করতুম, কোনও একটা নতুন কাজ হাতে নিতুম, অমনি হঠাৎ শোন্‌তে পেতুম বড়ছেলের জ্বর হয়েছে, মেয়েটার পেটের অসুখ হয়েচে, কিংবা ছোট ছেলেটা ছুট্‌তে গিয়ে ঠ্যাংটা ভেঙে ফেলেছে। ব্যাস্‌, সব কাজকর্ম্ম পণ্ড করে, সমস্ত ত্যাগ করে তখন এই নিয়েই ব্যস্ত হতে হত। কোথায় ডাক্তারের জন্য ছুট্‌ব? কোন্‌ ডাক্তারকে ডাক্‌ব? কোন্‌ ঘরে রোগীকে রাখ্‌ব? প্রথমত গেল এই সব ব্যাপার। তারপরে আরম্ভ হল একের পর এক ইন্‌জেকসন্‌, মিনিটে মিনিটে গায়ের উত্তাপ লওয়া, ব্যবস্থাপত্রের ধুম, অষুধ আর মুহুর্মুহু ডাক্তারের দর্শন। এই উৎপাত শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই আর এক বিপদ ঘটল। এইরকম করে উৎপাতের পর উৎপাতে আমাদের পারিবারিক জীবন কাট্‌তে লাগ্‌লো। প্রকৃত বিপদ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার যে একমাত্র পন্থা আছে তা পূর্ব্বেই বলেছি। আমার পরিবারে যা হয়েছিল অনেক পরিবারের মধ্যেই তা হ'য়ে থাকে। আমার স্ত্রী তার ছেলে-মেয়েদের বড্ড বেশী ভালবাসতো, তাদের সুস্থ রাখবার জন্য ডাক্তারের সকল কথায়ই সরল বিশ্বাসী ছিল, কাজেই সন্তানের দ্বারা আমাদের জীবন ক্রমে ক্রমে ভাল না হয়ে আরও তিক্ত এবং বিষাক্ত হয়ে উঠ্‌ল!

"আমার এক কথা এই যে, ছেলেমেয়েই ঝগড়া বাধাবার নতুন নতুন ওজর হতে লাগ্‌ল। বড় ছেলেটি আমার কাছে বেশী প্রিয় ছিল, আমার স্ত্রী সবচেয়ে মেয়েটিকে বেশী ভালবাস্‌ত। এদের সুবিধা ও

অসুবিধার ওজরে আমরা ঝগড়া করতুম। তারপর যখন তারা বড় হয়ে উঠ্‌ল, আমি ছেলেটিকে আমার দলে টানতুম আর আমার স্ত্রী টানত মেয়েটিকে। এমনি করে বাল্যকালেই তারা বাপ-মার কাছ থেকে কি ভয়ানক, কি বিষময় শিক্ষাই পেয়েছিল। তখন কিন্তু একথা একেবারেই মাথায় আসে নি। শেষে হল এই, ঝগড়া হলেই ছেলেটা আমার সঙ্গে যোগ দিত, আর মেয়েটা,—সেটাকে দেখ্‌তে ঠিক তার মায়ের মত, আমার স্ত্রীর সঙ্গে যোগ দিত, আর আমার ওপরে ভয়ানক চটে যেত। মেয়েটাকে আমি দেখ্‌তে পারতুম না।"

১৬

স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম পজ্‌নিশেফের খুব কষ্ট হইতেছে, তাই আমি একেবারেই চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু তিনি চুপ করিলেন না। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমাদের জীবন এমনি ভাবে চল্‌ল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিদ্বেষের ভাবটা আমাদের ক্রমাগতই বেড়ে যেতে লাগ্‌ল। মতের অমিলের জন্য যে ঝগড়া হত তা নয়, মনের অমিলই ছিল ঝগড়ার মূল কারণ। শেষটায় দাঁড়াল এই যে, আমার স্ত্রীর কোন কথা শোন্‌বার আগেই আমি আমার অমত জানাতুম, আমার স্ত্রীও তার অমত জানাত। বিয়ের চতুর্থ বছরে আমরা দুই জনেই মনে মনে এই স্থির করলুম যে, পুনর্মিলনের আর কোনও আশা নেই। মিলনের চেষ্টাও দুইজনেই বন্ধ করলুম। প্রায়ই সমস্ত দৈনন্দিন ব্যাপারে এবং ছেলেমেয়ের সম্বন্ধেও আমি আমার ইচ্ছেয়ই চলতুম, আমার স্ত্রীও তার ইচ্ছামতই চল্‌ত। আমার ইচ্ছা বজায় না থাক্‌লেও কিছু ক্ষতি হত না, কিন্তু আমি তাও ত্যাগ করতে চাই নি ; কারণ আমার ধারণা ছিল যে, আমার স্ত্রী তা হলে মনে করবে

আমি জব্দ হয়ে গেচি। আর যাতেই কেন রাজী হই না, এটি আমার দ্বারা কিছুতেই হবে না এই ছিল আমার ভাব, আর তারও মনের ভাব এই-ই ছিল। সে মনে করত সে যা করেচে ঠিকই করচে, তার কোন অন্যায়ই হয় নি, যত দোষ আমার। আমিও নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ মনে করতুম। এক জায়গায় থাক্‌লে কেউই কোন কথা বলতুম না, আর বল্‌লেও নেহাৎ একটা বাজে কথাই বলতুম, যেমন 'কটা বেজেচে?' 'শোবার সময় হল কি?' 'আজকে কি খাওয়া হবে?' 'আজকে কোন্ দিকে বেড়াতে যাব?' 'কাগজের খবর কি?' 'ডাক্তার ডাকতে পাঠাব কি?' 'মেয়েটার গলায় ঘা হয়েচে'।

"এই সীমানা ছাড়িয়ে একটু বেশী কথা কইতে গেলেই বিপদ ঘটত। সামান্য একটু বেশী কথা কওয়াই ঝগড়া আরম্ভ করার পক্ষে যথেষ্ট হত। টেবিলের চাদর, কফি, তাস খেলা প্রভৃতি অতি তুচ্ছ সব ব্যাপার নিয়েও আমাদের দুই পক্ষ থেকে চোখা চোখা বাক্যবাণ ছুটত। আমার ভিতরে তার প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের আগুন যেন দাউ দাউ করে জলত। তার প্রত্যেকটি কাজ, প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গীট—চা ঢালা, চা খাওয়া, চলা ফেরা, সবই আমার ঘৃণা বাড়াত, যেন সে বড়ই কুকাজ কচ্ছে। তখন লক্ষ্য করি নি যে, আমার অন্তরেও যা তার অন্তরেও ঠিক তাই, দুজনেরই মনের বিষয়ের পরিমাণ একেবারে সমান। লোকে যে সময়কে খুব ভালবাসার সময় বলে থাকে আমাদের সেই সময়ের কাহিনী ত এই।

"কিছুদিন 'ভালবাসা'র পরেই ঘৃণা এল। কয়েকদিন আমাদের এই "ভালবাসায়' কাটে আবার ঘৃণায় কাটে বহু দিন। তখনও আমরা বুঝতে পারি নি যে এই 'ভালবাসা' এবং ঘৃণা অন্তরের একটি জিনিষেরই দুটী বিপরীত দিক।

"আমাদের প্রকৃত অবস্থাটা যদি বুঝ্‌তে পারতুম তা হলে এরকম ভাবে একত্রে বাস করা অত্যন্ত ভয়ানক হত। আমরা তা বুঝ্‌তে পারি না, যারা নিয়ত এবং সুনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করে না তাদের পক্ষে এইটিই শাস্তি। এ রকম জীবনে তাদের চোখের সামনে এমন ধোঁয়া থাকে যে তারা প্রকৃত অবস্থা দেখ্‌তে পায়না, চোখ ঘোলাটে হয়ে যায় কিনা। আমাদেরও তাই হয়েছিল, ধোঁয়ায় সত্যিকার জিনিষটি দেখ্‌তে পাইনি। নিজের ও ছেলেমেয়েদের পোষাক পরিচ্ছদ, তাদের লেখাপড়া, স্বাস্থ্য, ঘরের আসবাবপত্র এবং ঘরের নানা কাজে মন দিয়ে আমাদের অবস্থার অতি ভীষণ বাস্তবিকতা আমার স্ত্রী ভুলে যেত। আর আমি? আমারও নিজেকে ভোলবার উপায় ছিল, আমারও দৈনিক কাজের নেশা ছিল। খেলাধূলার নেশা ছিল। কাজেই আমরা জেনেই একটা কিছু লইয়া ব্যস্ত থাকতুম, আর দুই জনেই ভাবতুম যতই বেশী নানান কাজে ব্যস্ত থাকব ততই আমাদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ বাড়্‌বে।

"আমি ভাবতুম তাকে এই রকম করে জব্দ কচ্ছি। তাকে হয়ত বল্‌লুম,—'কাল রাত্তিরে তুমি আমার মুখ ভেঙ্‌চ্ছো, সমস্ত রাত আমায় ঘুমুতে দাওনি, হাড় জ্বালিয়েচ। আমিও দেখে নিচ্ছি, আজ চল্লুম আমাদের এক সভায়।' সে স্পষ্ট বলে দিলে, 'আমাদের জন্য তোমার চিন্তিত হওয়ার কোনই কারণ নেই। ছেলেটার জন্য সমস্ত রাত একবারটিও চোখ বুজ্‌তে পারিনি।'

"এমনি ভাবে আমরা এমন একটা মেঘের আড়ালে রইলুম যে, প্রকৃত অবস্থা বুঝ্‌তে পারলুম না। যে বিশেষ ঘটনাটি আমার জীবনে হয়ে গেচে তা যদি না হত, তা হলে বুড়ো বয়স অবধি আমি সপরিবারেই হয়ত থাকৃতে পারতুম, আর বরাবরই বিশ্বাস করতুম

যে, আমি খুবই সৎলোক, খুবই ভাল লোক। যে ভীষণ ঘৃণিত মিথ্যার আবরণে আমরা ঢাকা থাকি তা হয়ত কখনো দেখ্‌তে পেতুম না, তখনো যে চোখ ফোটেনি। চিরটা কালই একজন আর এক জনের জীবনে বিষ ছিটিয়ে দিয়ে চোখ বুজে থাক্‌বার চেষ্টা করতুম, জানতুম না—আমরা যে ভীষণ নরকে বাস কচ্ছিলুম, প্রায় সবই, অন্ততঃ খুব বেশীর ভাগ স্বামী-স্ত্রীই তেমনি নরকে বাস করে। নিজেই তখন বুঝ্‌তে পারিনি যে নরকে রয়েচি, অন্যের কথা কি আর ভাব্‌ব ?

"সাধারণতঃ ভাল লোকের সঙ্গে ভাল লোকের, আর বদ লোকের সঙ্গে বদ লোকের কি আশ্চর্য্য রকমের মিল রয়েচে! যখন বাপ-মা নিজেদের জীবন অসহ্য দুঃখময় করে তোলে তখন ছেলেপুলেদের মঙ্গলের জন্য এমন কোন নগরে নিয়ে তাদের বাস করা দরকার যেখানকার অবস্থা আবহাওয়া তাদের শিক্ষার পক্ষে অনুকূল।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর তিনি এমন এক শব্দ করিতে লাগিলেন যে, তা দীর্ঘশ্বাস ও চাপা কান্নার শব্দ বলিয়াই মনে হইল। আমরা একটা ষ্টেশনের কাছে আসিতেছিলাম।

তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কটা বেজেছে এখন ?"

আমি আমার ঘড়ী দেখিলাম, তখন রাত দু'টা।

তিনি বলিলেন, "আপনি কি খুব ক্লান্ত হননি ? খুবই কষ্ট হচ্ছে আপনার।"

আমি বলিলাম, "না, না, আমি ক্লান্ত হইনি। আপনিই নিশ্চয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।"

তিনি বলিলেন, "আমার দম্ আট্‌কে আস্‌চে। একটু কাল আমায়

ক্ষমা করুন। এক মিনিটের জন্য আমি বেরিয়ে প্লাট্‌ফরমে যাব, একটু খাবার খাব, একটু জল নিয়ে আসব।”

তিনি টলিতে টলিতে গাড়ী থেকে নামিয়া গেলেন।

আমি আমার জায়গায়ই বসিয়া রহিলাম, আর তাঁর কথাগুলি ভাবিতে লাগিলাম। ভাবিতে ভাবিতে আমি এমন তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম যে, তিনি আমার সামনের দরজা দিয়া গাড়ীতে ঢুকিয়া বসিলেন অথচ আমি কিছুই টের পাই নাই। জল খাইয়া একটু শান্ত এবং সুস্থ হইয়া যখন তিনি কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন তখন আমার চমক ভাঙিল।

১৭

তিনি বলিতে লাগিলেন, “বুঝতে পাচ্ছি আমার ঠিক বক্তব্য বিষয় যা, তা থেকে ক্রমাগত দূরে গিয়ে পড়চি। আসল কথা এই—বহু দিন এই নিয়ে মাথা ঘামিয়েচি, কাজেই অন্যে এটা যে চোখে দেখে আমি সে চোখে দেখি নে, তাই আপনার কাছে সব কথা খুলে বলাই ভাল মনে কচ্ছি। আপনি কষ্ট করে শুন্‌চেন, আপনাকে বার বার ধন্যবাদ দিচ্ছি।

“পল্লী অঞ্চল ছেড়ে আমরা একটি সহরে বাস করবার জন্য গেলুম। যার জীবন দুঃখে ও অশান্তিতে ভরা সে সহরে গিয়ে অনেকটা সোয়াস্তি পায়, কারণ সে এতই ব্যস্ত থাকে যে নিজেকে দেখবার, নিজের কথা ভাববার সময় আর থাকে না। তার নিজের যে সবই পচে গলে গেচে এটা টের না পেয়েও একটা লোক বহু দিন সহরে থাক্‌তে পারে। নিজেকে সে কখন পরীক্ষা করবে? সব সময়েই ব্যস্ত। এটা দেখা,

সেটা দেখা, এর সঙ্গে দেখা করা, তার সঙ্গে কথা কওয়া, ছেলে মেয়ের লেখাপড়ার বন্দোবস্ত করা, গৃহ শিক্ষকের সঙ্গে ছেলেদের সম্বন্ধে আলোচনা করা, ছেলেদের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখা, বন্ধু বান্ধবদের বাড়ী যাওয়া ; নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করা এ সব ত আছেই, তা ছাড়া নিজের এ অসুখ সে অসুখ, ডাক্তার ডাকা অষুধ কেনা,—এই সব নিয়ে নানান রকমের ছুটাছুটি। এই রকমে জীবনটা হয়ে দাঁড়ায় একটা মস্ত বিড়ম্বনা।

আমরা যখন সহরে বাস করতে লাগলুম আমাদের জীবনটা ঠিক এমনি হয়ে উঠল। আমাদের দৈনন্দিন যন্ত্রণাও একটু কম টের পেলুম। সহরে নতুন বাড়ীতে আসা, সব সাজানো গোছানো, গ্রামে ও সহরে কিছুদিন যাতায়াত ক'রে জিনিষ পত্র আনা—প্রভৃতি কাজে প্রথমটায় বেশ ফুর্ত্তিই পাওয়া গেল।

"সহরে এসে এক শীত বেশ কেটে গেল। পরের বছর শীতকালে এক ঘটনা হয়। যদি এইটিই না ঘটত তা হ'লে আমার জীবনে শেষে যা হয়েচে তা মোটেই হতনা। আমার স্ত্রীর স্বাস্থ্য মন্দ ছিল না, তবুও যাতে তার আর সন্তান না হয় ডাক্তাররা সেই উপদেশ দিলে। তাদের উপদেশ কি করে কার্য্যে পরিণত করা যায় তাও তাকে শিখিয়ে দিলে। আমি এর ভয়ানক বিরোধী হলুম। কিন্তু সে আমার অনুনয় বিনয় কিছুই শুনলে না, ডাক্তারের কথা রক্ষা করবার জন্য ভয়ানক জিদ্ ধরলে। কৃষকেরও ছেলে পুলের দরকার, যদিও অনেক সময় তাদের ভরণ পোষণ খুব শক্ত। ছেলেপুলের জন্যই বিবাহ ক্রিয়াকে সমর্থন করা চলে। সন্তানের দরকার না থাকলে বিবাহের কি প্রয়োজন? সন্তান ছাড়া সে প্রয়োজন পশুর, মানুষের নয়। কিন্তু আমাদের ছেলেমেয়ে ছিল, আর দরকার ছিল না, বরং আরও বেশী খরচ, বেশী

উদ্বেগ ও যন্ত্রণার কারণই হত, সুতরাং আমাদের স্বামী স্ত্রীর আর একত্রে বাস সমর্থন করা ত যায় না। কৃত্রিম উপায়ে সন্তান সম্ভাবনাই নিবারণ করি, কিংবা সন্তান হওয়া দুর্ভাগ্য বলেই মনে করি অথবা অসাবধানতার ফল মনে করিয়াই করি না কেন, এটা সমর্থন যোগ্য একেবারেই নয়। নৈতিক আদর্শ থেকে আমরা এতই নীচে এসে পড়েছি যে নৈতিকতার অভাবটা বোধ করার শক্তিও আমাদের নেই। আমাদের দেশের প্রায় সব শিক্ষিত লোকই এমন জীবন যাপন করে যে তাদের বিবেকেও ঘা লাগে না। এজন্য অনুতাপও আমাদের হয় না, কারণ বিবেক বলে কোন জিনিষ আমাদের নেই। স্বামী কিংবা স্ত্রী—কারুর মনেই এতে ঘা লাগে না। এখন কথা হচ্ছে এই—সমাজের সকলেই এই রকম করে ব'লে যে সমাজের দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াব না এমন কারণ কি আছে? এজন্য ফৌজদারী আইনের ভয় পেলে ত চলবে না। অতি-ঘৃণিত দুশ্চরিত্রা পাড়াগেঁয়ে কুমারীরা আর সৈনিকের স্ত্রীরাই অনেকে তাদের শিশুসন্তান কূয়ায়; খানায় ফেলে দেয়। এরা এতই জঘন্য যে এদের জেলে দেয়ার ব্যবস্থাটা খুবই ভাল। কিন্তু আমরা কি করি? আমাদের জেলে যেতে হয় না, আমরা খুব ভদ্রভাবে, খুব সভ্যভাবে ঠিক ঐ একই কাজ করি।

"দুবছর কেটে গেল। দেখা গেল যে ডাক্তারের উপদেশের ফল ফল্‌তে আরম্ভ হয়েচে। আমার স্ত্রীর চেহারা আগের চেয়ে ঢের ভাল হল। সেও তা বুঝ্‌লে, তার সৌন্দর্য্য নিয়ে অনেক ভাব্‌তও। ত্রিশ বছরের খুব ধনী কোপনস্বভাবা, বিলাসে আকণ্ঠ মগ্ন মাতৃত্বের দায়ীত্বহীনা যুবতীরই মত তার সৌন্দর্য্যও তার মনটাকে আলোড়িত ও উত্তেজিত করে তুলেছিল। সে যেখানে যেত মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌ত, মানুষকে ভোলাবার চেষ্টা কর্‌ত। বহুদিন আস্তাবলে আবদ্ধ

থাকার পর হঠাৎ লাগাম ছাড়া হলে প্রচুর খাদ্যে পরিপুষ্ট বলবান চঞ্চল ঘোড়ার যে অবস্থা হয় আমার স্ত্রীর অবস্থাও তাই হয়েছিল। আমাদের সমাজের শতকরা নিরেনব্বুই জন স্ত্রীলোকেরই মত তারও সামাজিক বা নৈতিক কোন প্রতিবন্ধক ছিল না। আমি এটি বেশ বুঝলুম, তাই আমার ভয়ানক আতঙ্ক হল। ভাব্‌লুম এর পরিণাম কি? এই উচ্ছৃঙ্খলতা, এই চরিত্রহীনতার ভবিষ্যৎ ফল কি?

১৮

হঠাৎ উঠিয়া তিনি জানালার কাছে গেলেন।

প্রায় তিন চারি মিনিট ধরিয়া নিঃশব্দে নিশ্চল ভাবে জানালার দিকে তিনি চাহিয়া রহিলেন। তারপর একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আবার আমার সামনে আসিয়া বসিলেন।

তাঁর মুখের ভাব তখন সম্পূর্ণ বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। তাঁর মুখ চোখে বিষাদ মাখানো যেন তাঁর ভিতরে একটা প্রবল ঝড় বহিতেছে, কিন্তু ঠোঁটে এক রকম অদ্ভুত হাসি খেলিতেছিল।

তিনি বলিলেন, "আমি একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েচি, তা হলেও আমার এই কাহিনী শেষ করবই। এখনো যথেষ্ট সময় আছে, এখনো ভোর হয় নি।"

এই বলিয়াই একটি চুরুট বাহির করিয়া ধরাইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, হ্যাঁ, আমার স্ত্রী পূর্ব্বের চেয়ে হৃষ্ট-পুষ্ট হল। তার মাতৃত্বের চিন্তা নেই, ছেলে মেয়ের জন্য তার যে ভাবনা ছিল তা আর নেই। আর তারাও একটু বড় হয়েচে। আমার স্ত্রীর এখন অন্য রকমের চিন্তা, নিতান্ত অলস নিরুদ্বেগ মনের যেমন হয়ে থাকে। সে ভাব্‌লে

যে তার নেশা কেটে গেছে, সে জানতে পেরেছে যে দুনিয়া কেবল ফুর্ত্তি কর, এতদিন সে এটা জানতে পারে নি; পৃথিবীর এই ভোগ বিলাস আর সে ছেড়ে দেবে না, সময় কেটে গেলে শেষে দেরী হয়ে যাবে। এইটিই ছিল তার মনের ভাব। তার সমস্ত শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য ছিল 'ভালবাসা' এবং সেই শিক্ষানুসারে পৃথিবীতে এই একটি জিনিষই আছে যা সব জিনিষেরই সার। তার বিবাহিত জীবনেও 'ভালবাসা'র কিছু অভিজ্ঞতা ছিল, তবে সে যতটা আশা করেছিল ততটা একেবারেই নয়, কিংবা যতটা ভালবাসবে বলে নিজেও স্থির করেছিল এবং ব্যাকুল প্রতীক্ষায় ছিল, মোটেই সে তত ভালবাসেনি। বরং তার জীবনে নৈরাশ্য আর কষ্ট অনেকবারই তাকে অভিভূত করে ফেলেছিল। যত যন্ত্রণা সে ভোগ করেচে তার মধ্যে সন্তানের জন্মও একটা। এ সম্বন্ধে সে স্বপ্নেও কখনো কিছু কল্পনা করে নি। এই যন্ত্রণাই তাকে একেবারে কাবু করে ফেলেছিল। এমন সময়ে ডাক্তারের প্রক্রিয়া সফল হল, ডাক্তারের শিক্ষায় সে এই কষ্টকর কর্ত্তব্য থেকে অব্যাহতি পেলে। এখন তার জীবনের উদ্দেশ্য শুধু 'প্রেম' করাই সে মনে করলে। এতে তার অপার আনন্দ হ'ল।

"কিন্তু ঈর্ষা ও ঘৃণায় ভরা স্বামীকে ভালবাসার ইচ্ছা তার একেবারে ছিল না, নতুন ভালবাসার কল্পনা তার মন ভরপূর হয়েছিল। সে চারিদিকে যেমন একটা কিছুর সন্ধান করত, আমার কিন্তু এই রকমেরই ধারণা হয়েছিল। আমার মনটা আলোড়িত করে এমন একটা অশান্তির ঝড় উঠল যে তা চেপে রাখা আমার পক্ষে বড়ই শক্ত হয়ে পড়ল। আমার এই বিশ্বাসের একটা বিশেষ কারণ এই ছিল যে অন্যের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় তার মনের এ কথা ব্যক্ত করার কোন সুযোগই সে ছেড়ে দেয় নি। যাতে এই কথাগুলো আমার কাণে আসে সে

ইচ্ছাও তার খুবই ছিল। কখনো বা ঠাট্টার ভাবে, কখনো বা গম্ভীর ভাবে সে প্রায়ই বল্‌ত যে মাতৃত্বের চিন্তা জীবনের পক্ষে একটা মস্ত বিড়ম্বনা, ছেলের জন্য জীবনের ভোগ বিলাস সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে ভরা যৌবনটি নষ্ট করা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। ছেলেমেয়ের যত্নও সে এই সময়ে আগের মত করত না। সে মন দিত এখন তার নিজের দিকে, নিজের বিলাস ব্যসনের দিকে। কিসে তাকে সুন্দর দেখাবে এই চেষ্টাই ছিল তার সব চাইতে বেশী। তার অন্তরের অভিলাস সে গোপন করবার চেষ্টা কর্‌ত। এদিকে দুই একটা বিশেষ গুণ আয়ত্ত কর্‌বার চেষ্টাও তার ছিল। সে আবার সঙ্গীত চর্চ্চা আরম্ভ করে দিলে। এক সময় খুব ভালো পিয়ানো বাজাত, এবার পিয়ানো আর গান নিয়েই তার দিন কেটে যেতে লাগ্‌ল। আমাদের জীবনের অতি ভীষণ বিপদ-পাতের সুস্পষ্ট সূচনা এখানেই আরম্ভ হ'ল।"

আবার তিনি জানলার দিকে ফিরিলেন খানিকক্ষণ বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁর অন্তরের চাপা কান্না যেন চোখ ফাটিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছিল। খুব কষ্ট করিয়া নিজেকে সামলাইয়া তিনি আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, "হাঁ এসময়ে সেই লোকটা এসে হাজির হল।"

তাঁর কথা আট্‌কাইয়া গেল। তিনি কথা কহিতে পারিলেন না। সেই লোকটা যে কে, তার নামই বা কি, একথা একেবারে তাঁর মনে একটা তীব্র বেদনা হইতেছিল—ইহা আমি বুঝিতে পারিলাম। তিনি সুস্থ হইয়া কথা কহিতে খুবই চেষ্টা করিলেন। খানিক পরে মনটা দৃঢ় করিয়া তিনি বলিলেন,—

"সে লোকটা ছিল অত্যন্ত জঘন্য, অবশ্যি আমার মতে। আমার জীবনে তাকে দিয়ে যে বিষম ঘটনা ঘটেচে সেইজন্যই তাকে জঘন্য

বল্‌চি তা নয়, সত্যই সে ছিল অতি ঘৃণিত, অতি হীন। এই লোকটা জঘন্য, এর দ্বারা এইটিই প্রমাণিত হচ্ছে যে, আমার স্ত্রীও ছিল অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতির, একেবারে দায়িত্বজ্ঞান শূন্য। এই লোকটা না এলে অবস্থা অন্যরকমের হত। আমাদের বরাতে এই ছিল, তাই সেও এসে জুট্‌ল।"

আবার খানিকক্ষণ তিনি চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, "সে লোকটাও খুব সঙ্গীতজ্ঞ, বেহালা বাজাতে খুব ভালই পার্‌ত। বেহালা বাজিয়ে সে অর্থোপার্জ্জন কর্‌ত, কখনো বা সখ করেও বাজাত, তার বাবা আমার বাবারই প্রতিবেশী ছিলেন। তাঁর জমিজমাও খুব ছিল। বহুদিন পূর্ব্বেই তাঁর টাকা পয়সা সবই তিনি নষ্ট করে গিয়েছিলেন। তাঁর তিনটি ছেলে। যে রকমেই হোক্ প্রথম দুটির একটা ব্যবস্থা হল। ছোটটিকে পাঠিয়ে দেওয়া হল প্যারিসে তার ধর্ম্মের মায়ের কাছে। প্যারিসের সঙ্গীতবিদ্যালয়ে সে বেহালা বাজাতে খুব পারদর্শী হল। এ বিদ্যায় তার স্বাভাবিক শক্তিও বেশ ছিল। তারপর অনেক বড় বড় আসরেও সে বাজিয়েচে। এই লোকটাই—"

এখানে কোন একটা কথা বলিতে গিয়া পজ্‌নিশেফ্ নিজকে সাম্‌লাইবার খুব চেষ্টা করিলেন, শেষটায় খুব দ্রুত বলিতে লাগিলেন,—

"জানিনে সে লোকটার সে সময়ে কি রকমে চল্‌ত। এইটুকু জানি যে সেই বছরে সে রাসিয়ায় ফিরে এল। ফিরে এসেই সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। তার ভিজে, লাল চোখ দুটির আকৃতি ছিল ঠিক বাদামটির মত, ঠোঁট দুটি হাসি জড়ানো, গোঁফ জোড়া মোম দিয়ে পাকানো, চুলটি একেবারে হাল্ ফ্যাসানে ছাঁটা; আর মুখখানা বিরস হলেও এমন রকমের ছিল যাকে মেয়েছেলেরা বলে 'দেখতে মন্দ

নয়', শরীরটি পাতলা, কিন্তু মোটের ওপরে কদাকার নয়। সে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা দেখাত, তা তখনকার অবস্থায় অন্যায় বলেও মনে হয় নি; কিন্তু যদি কোন রকমে ঘনিষ্ঠতা দেখাবার তেমন উৎসাহ না পেত, কিংবা একটুও যদি বাধা পেত তা হলেই আর বেশীক্ষণ থাকৃত না, এতে সে খুব হুসিয়ার ছিল। বাইরে চালচলন পোষাক পরিচ্ছদের দিকে তার খুবই নজর ছিল। একেবারে প্যারিসের তৈরি সুন্দর রংচঙে গলবন্ধ সব সময়েই ঝক্ ঝক্ করত। মোটামুটি, যাতে পাঁচজন লোকের চোখ পড়ে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের নজর পড়ে আর তারা তাকে দিব্যি পুরুষটি বলে মনে করে, এই রকম সব সামান্য বিশেষত্বের দিকেই তার খুব লক্ষ্য ছিল। কথাবার্ত্তারও সে বেশ রসিক ছিল। যে কোন বিষয়ে সে কথা কইত তাতেই সে অনুরূপ অন্য একটা বিষয়েরই উল্লেখ করত, আর কোন কথাই সম্পূর্ণ বলৃত না, একটা কথায় খানিকটা বলেই ছেড়ে দিলে যেন আমরা সবই জানি, আর বাকী কথাটা আমরাই পূরণ করে নিতে পারি। এই লোকটি আর তার বেহালাই হল আমার জীবনে যা ঘটেছে তার কারণ।

"আমার বিচারের সময়ে মামলার মূল বৃত্তান্তটি এমন সব কথা দিয়ে এমনি ভাবে সাজানো হয়েছিল যে আমি শুধু বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হয়ে আমার স্ত্রীকে খুন করেচি। এটা কিন্তু একেবারেই ঠিক নয়। আমি বলৃতে চাই যে এইটিকে সত্য ব'লে দাঁড় করবার পূর্ব্বে এর ঢের পরিবর্ত্তন ও রূপান্তর হওয়া দরকার। আমার স্ত্রী বিশ্বাসঘাতকতা করেচে, আমার সম্মান নষ্ট করেচে—এতে কারই কোন সন্দেহ রইল না; আমি তারই প্রতিশোধ লওয়ার জন্য তাকে রাগের মাথায় খুন করে ফেলেচি, এই মনে করেই আমাকে বিচারক খালাস দিলেন। বিচারের সময় সত্যিকার ব্যাপারটি আনুপূর্ব্বিক বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছিলুম,

কিন্তু আমার কথার অর্থ করা হল এই যে, আমি অমার স্ত্রীর সুনাম রক্ষা করার ইচ্ছায়ই এই সব বল্‌চি, সেই বেহালা বাজিয়ের সঙ্গে আমার স্ত্রীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতায়, তা যেরকমেই হোক না কেন, কিছুই এসে যায় নি। এই ঘটনার জন্য যা খুব বেশী দায়ী তা আপনাকে পূর্ব্বেই বলেচি। যে ঘৃণা, ভালবাসার যে অভাব আমাদের দুজনের মাঝখানে একটা অতলস্পর্শী গহন তৈরি করে রেখেছিল, একটা বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল সেইটিই দায়ী, সেইটিই মূল কারণ। বিপুল গহ্বর দুইজনেরই মাঝখানে হাঁ করে ছিল; একটু নড়্‌লেই তার ভেতরে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। এও তাই হয়েচে। সে সময়ে আমাদের ঝগড়া হত একেবারে জানোয়ারের মত। এই লোকটি যদি না আস্‌ত অন্য লোক এসেও ওর কাজ ঠিক ঐ রকম করেই কর্‌ত। যাই হোক, আমি এখন বল্‌তে চাই যে আমার অবস্থায় স্বামীরা হয় সম্পূর্ণ রকমে স্ত্রীর বশীভূত হয়ে চল্‌বেন, স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মোটেই যাবেন না, না হয় স্ত্রী ত্যাগ কর্‌বেন। এ না করলে তার ফলে হবে তাঁরা আত্মঘাতী হবেন, না হয় স্ত্রী-ঘাতী হবেন, আমি যেমন হয়েচি। এই দুই পন্থার একটাও যাদের দরকার হয় না এরকম লোকের সংখ্যা খুব বিরল। শেষ ঘটনার পূর্ব্বে অনেকবার আমি আত্মহত্যা করবার উপক্রম করে-ছিলুম। কত সহ্য করা যায়? সহ্য করারও একটা সীমা আছে ত। আমার স্ত্রীও একাধিকবার বিষপান করে সব যন্ত্রণার শেষ কর্‌তে উপক্রম করেছিল।"

আমি নিঃশব্দে ভাবিতে লাগিলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন, "চরম ঘটনা ঘট্‌বার কিছুদিন পূর্ব্বে স্ত্রীর সঙ্গে আমার একদফা তুমুল ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল। তারপর কয়েকদিন দুজনেই একদম্ চুপ। এও একরকম মিটমাটের ভাবই চল্‌ছিল। নিস্তব্ধতা ভাঙ্‌বার অন্য কোন সুযোগ না পেয়ে আমার প্রদর্শনীর একটা কুকুর সম্বন্ধে কথা আরম্ভ কর্‌লুম। আমি বল্‌লুম—'কুকুরটাকে একটা মেডেল দেয়া হয়েচে।' আমার স্ত্রী অমনি বল্‌লে, 'না, কুকুরটাকে খুব প্রশংসা করা হয়েচে বটে, কিন্তু মেডেল্ দেয়া হয় নি।' এই নিয়েই তর্ক আরম্ভ হল আর কি। আমরা তখন এক বিষয় থেকে আর এক বিষয়, এক কথা থেকে আর এক কথা এনে ফেল্‌লুম; এমনি করে আবার ঝগড়া লেগে গেল। দুজনেই দুজনকে গালাগাল দিতে লাগলুম। 'হ্যাঁ, এ আমি বহুপূর্ব্বেই জান্‌তুম, তোমার ধরণই এই', 'তুমি নিজে ওরকম বলেচ,' 'আমি বলি নি', 'আমি কি তাহলে মিথ্যাবাদী?' এই রকম কত কি! এই রকম অবস্থায় একটু পরেই এমন মনে হয় যে আত্মহত্যা করি, না হয় স্ত্রীকেই খুন করি। চরিত্র ভাল না থাক্‌লে কি আর মাথা স্থির থাকে! আমার স্ত্রীর অবস্থা ছিল আমার চেয়েও খারাপ। আমি যা কিছু বলতুম সে ইচ্ছে করেই তার উল্টো মানে করত, তার প্রত্যেকটি কথাই যেন বিষ লাগানো। আঁতে ঘা না মেরে কথাই কইত না, পুরোণো-ক্ষত বের করে খোঁচা দিত; আর আমার কোথায় কি ক্ষত আছে তা সে খুব ভাল করেই জান্‌ত ত। ঝগ্‌ড়া তুমুল বেগে চল্‌ল। আমি শেষটায় বাঘের মত গর্জ্জন করে উঠলুম, 'চোপরও'।

সে তীরবেগে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে ছেলেদের ঘরের দিকে চলল। তাকে থামিয়ে আমার কথা ভাল করে শোনবার জন্য তার পেছন পেছন গিয়ে যেমনি তার জামার আস্তিনটা ধরলুম অমনি সে চেঁচিয়ে ছেলেমেয়েদের ডেকে বললে, 'তোদের বাপ আমায় মেরে ফেললে রে, মেরে ফেললে!' আমি গর্জ্জে উঠলুম, 'মিছে কথা কয়ো না খবরদার।' সেও ঠিক তেমনি জোরেই চেঁচিয়ে বললে, 'তুমি কি আমাকে এই নতুন মারলে না কি? এর আগে বুঝি আর মারনি?' ছেলে-মেয়েরা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসে তাকেই জড়িয়ে ধরলে; সে আবার তাদের ঠাণ্ডা করতে লাগল। আমি বললুম, 'খবরদার এ রকম প্রতারণা করো না।' 'তোমার কাছে ত সবই প্রতারণা! তোমার অসাধ্য কোন কাজ আছে কি? তুমি খুন করে রেখেও বলতে পার যে মরণের ভাণ কচ্ছে। তোমায় এবার হাড়ে হাড়ে চিনেছি। তুমি ত সেইটিই চাও, তা কি আর আমার বুঝতে বাকী আছে?'

আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, 'কুকুরের মতন মরে পড়ে থাক এই-ই চাই।' এত বড় ভীষণ রূঢ় কথা কি করে যে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল তা বলতে পারি নে, কিন্তু বলে আমি নিজেই চমকে উঠলুম। যাই হোক, সেখান থেকে ছুটে গিয়ে আমার পড়ার ঘরে ঢুকলুম। সেখানে বসে একটা চুরুট ধরালুম; সেখানে বসেই টের পেলুম সে বেরুবার জন্য পাশের ঘরে তৈরি হচ্ছে। ডেকে জিজ্ঞেস করলুম—'কোথায় যাচ্ছ?' সে কোনও জবাব দিলে না। ভাবলুম—'চুলোয় যাক গে'। পড়ার ঘরেই শুয়ে শুয়ে চুরুট খেতে লাগলুম। প্রতিশোধ লওয়ার হাজার রকমের ফন্দী আমার মাথায় হুড়মুড় করে ঢুকতে লাগল। কি করে আবার সংসারে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা যায় সে ভাবনাও মাথাটাকে অস্থির করে তুললে। চুরুটে কসে টান মারতে

মারতে এই সব ভাবছিলুম। এক একবার ভাবি এখান থেকে চলে যাই, আমেরিকায় গিয়ে গোপন করে থাকি, কি করে আপদ দূর করি? এমন স্ত্রীকে একেবারে ত্যাগ করতে পারলে, এর সংস্পর্শ থেকে অব্যাহতি পেলেই আমি আগে যেমন ছিলুম ঠিক তেমনি থাক্‌ব। আর একটি ভাল সুন্দরী যুবতীকে এনে গৃহলক্ষ্মী করব। এখন এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই কি করে? এ যদি মরে যায় ত ভাল, না হয় বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য দরখাস্ত করতে হবে। চুরুটের ধোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার মগজের মধ্যেও এই রকম চিন্তার ধোঁয়ার কুণ্ডলী তৈরী হতে লাগ্‌ল।

"বাড়ীর কাজ যেমন চলে তেমনি চল্‌ছিল। ছেলে মেয়ের শিক্ষয়িত্রী এসে জিজ্ঞেস্ কর্‌লেন—'গিন্নীমা কোথায়? কখন ফিরবেন?' চাকর এসে জিজ্ঞেস্ কর্‌লে, 'চা দেব কি?' আমি খাবার ঘরে গেলুম, ছেলে মেয়ে সবই সেখানে ছিল। তারা সকলেই বিরক্তির চোখে আমার দিকে তাকালে, বিশেষতঃ মেয়েটী। আমাদের ব্যাপারটা সে কিছু কিছু বুঝ্‌তে আরম্ভ করেচে। তখনও আমার স্ত্রী ফিরে আসে নি। কি আর করা যায়? সকলেই চুপ করে চা পান কর্‌লুম। বিকেল বেলা গেল, সন্ধ্যাও কেটে গেল, রাত্তির বেশী হতে চল্‌ল তবুও স্ত্রী ফিরে এলো না। আমার ভয়ানক রাগও হল আবার ভয়ও হল। না এসে ছেলেমেয়েদের এবং আমাকেও এই সময়ে কষ্ট দিচ্ছে—এই জন্য হল রাগ, কারণ সেত ফিরে আসবেই, এখনও আস্‌চে না কেন? আর ভয় হল এর জন্য—যদি সে রাগের মাথায় আত্মহত্যা করে বসে! ভয় হতেই ভাব্‌লুম যে আমি নিজেই গিয়ে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসি। কিন্তু কোথায় তাকে খুঁজ্‌ব? তার ভগ্নীর কাছে? সেখানে গিয়ে খোঁজ নেয়াত আমার পক্ষে অসম্ভব। যদি সে আমাকেই ঘা দিতে

চায়, তবে সে নিজেকেও ঘা দিক। যদি তার খোঁজে এখানে সেখানে ছুটোছুটি করে বেড়াই, তা হলেত আমি একেবারেই তার হাতের পুতুল হয়ে গেলুম, সেত ঠিক এই চায়। এর ফলত আরও খারাপ হবে, সে একেবারে পেয়ে বসবে! যদি সে তার ভগ্নীর বাড়ী না গিয়ে থাকে? যদি সে এতক্ষণে কোন একটা বিষম কাণ্ড করে থাকে! ভাব্‌তে ভাব্‌তে রাত্তির এগারোটা বেজে গেল। বারোটাও বাজ্‌ল। শোবার ঘরে আর গেলুম না, পড়ার ঘরেই জেগে বসে রইলুম। অন্যমনস্ক থাক্‌বার জন্য পড়া বা চিঠি লেখা প্রভৃতি বাজে কাজে মন দিবার চেষ্টা করলুম, পার্‌লুম না। বাইরে শব্দ শুন্‌লেই কাণ খাড়া করে রাখি। তখন ভয়ানক রেগে আছি একবার ঢুক্‌লেই কড়া কড়া কথা শোনাব। একটা, দুটো, তিনটে বাজ্‌ল। ঠায় বসে আছি। চারটেও বেজে গেল, তবুও সে ফিরল না। ভোর হয় হয় এমন সময় আমি আমার অজ্ঞাতসারেই ঘুমিয়ে পড়লুম। ঘুম থেকে উঠেও দেখি সে ফেরেনি। সংসারের দৈনিক কাজ কর্ম্ম যেমন চলে তেমনি চল্‌তে লাগ্‌ল, কেবল এই টুকু তফাৎ যে প্রত্যেকের মনে উদ্বেগ, অশান্তি আর ভয়। প্রত্যেকেই আমার দিকে এমন কটাক্ষপাত কচ্ছিল যেন সে নীরব ভাষায় আমার কত প্রশ্ন জিজ্ঞেস্ কচ্ছে, কত তিরস্কার কচ্ছে, যেন অশান্তির এক মাত্র কারণ আমিই! এদিকে আমার মনটার ভেতরেও একটা প্রচণ্ড লড়াই চল্‌ছিল; আমাদের ফেলে যাওয়ার জন্য রাগ, আর তার যদি কিছু ঘটে থাকে সেজন্য ভয়,—আমার মনটা একেবারে তোলপাড় কচ্ছিল। বেলা এগারোটার সময় তারই ভগ্নী তারই দূত হয়ে গাড়ী করে এল। আবার সেই পুরাণো কথাই আরম্ভ হল। সে জিজ্ঞেস্ কর্‌লে, 'এসব কি হচ্ছে বল ত? আমার বোনের অবস্থা ত ভয়ানক।' আমি বল্‌লুম, কিছুইত হয়নি, আমি কিছুই করিনি, তারই স্বভাবটা অদ্ভুত রকমের।' 'বেশ

এভাবে ত আর চলতে পারে না।’ আমি আগে তার সঙ্গে মিটমাট করতে যাচ্ছিনে। ছাড়াছাড়ির যদি দরকারই হয় তবে হোক্।’ তার ভগ্না চলে গেল। আমি স্পষ্টই বলে দিয়েচি যে আগে যেচে কিছু বল্‌বও না, খোসামোদ করে মিটমাটও করব না। কিন্তু ছেলেমেয়ের বিষণ্ণ সন্ত্রস্ত মুখের দিকে চেয়ে আমার মনটা আবার নরম হল। আমিই প্রথমে গিয়ে মিটমাট করতে রাজী হলুম। খানিকক্ষণ পায়চারী কর্‌তে কর্‌তে চুরুট টান্‌তে লাগলুম। তারপর আমার এই কদর্য্য অবস্থা আমার নিজের কাছেই চাপা দেবার জন্য খাবারের সঙ্গে খানিকটা মদ খেলুম।

“বিকেল বেলা তিনটার সময়ে আমার স্ত্রী নিজেই গাড়ী করে এল। আমায় দেখে কোন কথাই বল্‌লে না, ভাবলুম বুঝি সে আবার মিলনই চায়। তাই তাকে বল্‌লুম সে গালাগাল দিয়ে আমায় চটিয়েছিল বলেইত ঝগড়া বাধল। তার বিষাদ-মলিন মুখখানা অত্যন্ত কঠোর হয়ে উঠল, অত্যন্ত নির্ম্মম চোখে আমার দিকে ফিরে চেয়ে আমায় বল্‌লে সে মিটমাট কর্‌তে আসেনি, সে এসেচে ছেলেমেয়েদের নিয়ে যেতে, কারণ তাদের একসঙ্গে আর বাস করা অসম্ভব। এই রকমে দুটো একটা কথা হতেই আমিও বল্‌লুম মিলন চাই নে, একত্রে থাক্‌তে আমিও চাই নে। সে খুব চেঁচিয়ে কি একটা বলে ছুটে গিয়ে তার ঘরে ঢুকল, ধপাস করে দরজা বন্ধ করে খিল দিলে। দরজায় কত ধাক্কা মার্‌লুম, কোন জবাব পেলুম না। ভারি রাগ হল। আধ ঘণ্টা পরেই মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছে ছুটে এল। জিজ্ঞেস কর্‌লুম, ‘কি হয়েছে রে?’ বল্‌লে—‘মাকে ডেকেত সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।’ মেয়েকে নিয়ে অমনি ছুটলুম, দরজায় জোর ধাক্কা মার্‌তে লাগলুম, খিলটা ভাল আটকানো ছিল না, তাই দরজা খুলে গেল। ঘরে ঢুকেই স্ত্রীর বিছানার কাছে গেলুম। জামা গায়ে জুতো পায়ে—

এই অবস্থায়ই সে বিছানায় পড়ে আছে। বিছানার পাশে টেবিলের ওপরে একটি খালি বোতল রয়েচে, তাতে আফিং ছিল। তাকে সজ্ঞান কর্‌বার চেষ্টা করলুম। তারপর যখন তার প্রথম চৈতন্য হ'ল তখন চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল। যাই হোক্ আমাদের আপাততঃ আবার মিলন হল। কোন রকমের সন্ধি স্থাপন করা গেল বটে, কিন্তু আমাদের অন্তরের সেই ঘৃণাটুকু রয়েই গেল। এইটিই মনের বিষ কিনা। এই থেকেই ঝগড়া ঝাঁটি, মারামারি কাটাকাটি হয়, তখন অন্যের ঘাড়ে সমস্ত দোষের বোঝা ফেলে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করা হয়। নিজের দোষ যদি মানুষের নজরে পড়ে তাহলে ত আর এত গোলযোগ হয় না।

"যাই হোক, আমাদের কিছুদিন কোন রকমে কাটে, আবার ঝগড়া হয়। কখনো সপ্তাহে একবার, কখনো বা মাসে একবার, আবার কখনো বা রোজও ঝগড়া হত। ঐ একই রকমের ঝগড়া—কোন বৈচিত্র নেই, নতুনত্ব নেই। একবার আমি দেশ ছেড়ে চলে যাবার সঙ্কল্প করেছিলুম, পাস্ পোর্টের জন্য দরখাস্তও করেছিলুম। সেবারে ঝগড়া চলেছিল পুরো দু' দিন, তাও আগেকারই মতন কোন রকমে মিটে গেল ; আমার আর যাওয়া হল না।"

একটা বুক ভাঙা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "এই ভাবে আমাদের জীবন চল্‌চে এমন সময়ে এক দিন সেই লোকটা এসে হাজির হল। হাঁ তার নাম হচ্ছে ট্রুখা। মস্কোতে ফিরে এসেই একদিন সকাল বেলা সে আমার বাড়ীতে এল। তার সঙ্গে আমার দেখা হলো। পূর্ব্বে তার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল সে তা ভোলে নি। বহু আগেকার মত কথাবার্ত্তা সে প্রথমে মোটেই বলে নি, অপরিচিতের মতই কথাবার্ত্তা আরম্ভ করেছিল। আমি তার সঙ্গে পূর্ব্ব পরিচিত লোকের মতই ব্যবহার করলুম, সেও অমনি আত্মীয়তা দেখাতে একটু দ্বিধা বা কুণ্ঠা বোধ করলে না।

"তাকে দেখা অবধিই তার প্রতি আমার ঘৃণা হতে লাগল, কিন্তু আমার বরাতের এমনি দোষ যে, তাকে হটিয়ে দেয়া ত দূরের কথা, বরং তাকে আদর যত্নে বাড়িয়ে আমার ঘনিষ্ঠ করেই তুললুম। যদি সামান্য দু' একটা কথা কয়ে তাকে বিদায় করে দেই, আর আমার স্ত্রীর কাছে পরিচিত না করি, তা হলেই কিন্তু আপদ চুকে যায়। তা না করে বেহালা বাজানো সম্বন্ধে তার সঙ্গে নানান কথা জুড়ে দিলুম। আমিও বহুদিন পূর্ব্বে বেহালা বাজাতুম; এ কথাও সে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলে। আমি বললুম আমিত বাজানো এখন ছেড়েই দিয়েচি, তবে আমার স্ত্রী একজন খুব ভাল বাজিয়ে বটে। আশ্চর্য্য এই তার সঙ্গে যেদিন যে মুহূর্ত্তে আমার প্রথম দেখা হল তখন থেকেই তার সঙ্গে আমার যে রকমের সম্বন্ধ স্থাপিত হল সেটা পরে হওয়াই সম্ভব এবং সঙ্গত। তার সঙ্গে আমার যে ব্যবহার চলেছিল তা যেন সম্পূর্ণরূপেই আমার

ইচ্ছার বিরুদ্ধে করতুম, আমার অন্তরে ছিল ঘৃণা, অথচ তা মুখে বলতুম না। সে যা কিছু বলত তার ভেতরেই একটা কিছু আছে বলে মনে হত, অর্থাৎ লোকটি বাইরে একরকম ভেতরে অন্য রকম, বলে এক কথা ভাবে আর এক কথা, সরল ভাবে কোন কথাই কয় না। আমার ধারণা এই ছিল, কিন্তু কেন যে ছিল তা তখন বুঝতে পারি নি। যাই হোক আমার স্ত্রীর কাছে তাকে পরিচিত করে দিলুম। যেমন পরিচয় হওয়া অমনি গান বাজনার কথা আরম্ভ হয়ে গেল। সেও আমার স্ত্রীর সঙ্গে বাজাতে রাজী হল। দেখেছি সেই দিন সকালবেলা থেকে বরাবরই আমার স্ত্রীর মনটা ভারী খুসী ; চুলের পারিপাট্যে, সাজসজ্জায় চাল-চলনে তাকে ভারি চমৎকার দেখাতে লাগল। এটা বেশ স্পষ্টই বোঝা গেল যে, এই লোকটিকে পেয়েই আমার স্ত্রীর মনে আনন্দের বান ডেকেচে। মনে হল যেন সে একেবারে নতুন হয়ে গেচে। তার চোখে আনন্দ ও তৃপ্তি ফুটে উঠত, কিন্তু যখনই আমার চোখাচোখি হত তখনই আমার অন্তরের ভাবটি সে বুঝতে পারত, আর তার মুখের ভাব একদম বদলে যেত। অন্তরের ভাব গোপন রেখে এমন একটু হাসতুম যেন তাকে দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেচি। এমনি করে আরম্ভ হল ভীষণ প্রতারণা।

লম্পট যেমনি করে সুন্দরী রমণীর দিকে তাকায় সেও ঠিক তেমনি-ভাবে আমার স্ত্রীর দিকে তাকাত, অথচ যে সব কথাবার্ত্তা তখন চলত সেদিকে তার মন ত থাকতই না, কিন্তু জানাতে চেষ্টা করত যেন কথার দিকেই তার সমস্ত মন। আমার স্ত্রীর ভাবটা এই রকমেরই কিন্তু আমার কুটীল হাসিতেই তার মন মুসড়ে যেত ; আমি যে ঐ লোকটাকে লক্ষ্য করেই কুটীল হাসি হাসচি তা সে বুঝতে পারত। আমার মনে আছে যে তাকে প্রথম দেখা অবধিই আমার স্ত্রীর চোখ

আনন্দে উজ্জ্বল হয়েছিল, যেমন হয়েছিল আমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিন। মনে হত যেন একটা তড়িতের প্রবাহ তাকে আর আমার স্ত্রীকে একই বন্ধনে বেঁধে রেখেচে, তাদের পরস্পরের চাউনিতে, হাসিতে, চলনে তা স্পষ্ট বুঝতে পারা যেত। আমার স্ত্রী হাসলে সেও হাসত, আমার স্ত্রীর মুখখানা কোন কারণে লাল হয়ে উঠলে তার মুখখানাও লাল হয়ে উঠত। দুজনের মনেই তখন একই ভাবের স্রোত ছুটে চলেচে। আমরা প্যারিস সহর, গানবাজনা, এটা-ওটা অনেক বাজে কথা বলছিলুম। তারপর সে উঠল, দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে খানিকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইল। আমরা কি বলি, কি করি, এইটুকু দেখবার অপেক্ষায়ই সে ছিল।

সে সময়টা আমার বেশ পরিষ্কার মনে আছে। তাকে আবার আসবার জন্যে তখন আর অনুরোধ না করলেই হত, তা হলে আর অমন বিপদ ঘটত না। আমি একবার আমার স্ত্রীর দিকে আর একবার তারদিকে তাকালুম। তারপর আমার স্ত্রীর সঙ্গে বাজাবার জন্য সন্ধ্যার সময় তাকে বেহালা নিয়ে আসতে বললুম। আমার স্ত্রী বিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে রইল, তার মুখখানা লাল হয়ে উঠল, তার মনটা চঞ্চল হল, আর তার যেন একটু ভয়ও হল। সে আপত্তি জানালে, বললে সে নিজে ভাল বাজাতেই জানে না, তাতে একজন খুব ওস্তাদ বেহালা বাজিয়ের সঙ্গে সে বাজাবে কি করে? আমি ভারি বিরক্ত হলুম, আমার ভয়ানক জিদ্‌ও হল, ভাবলুম লোকটির সন্ধ্যার সময় আসাই চাই। লোকটার সাদা ঘাড়ের ওপর কালো কালো চুল ছিল, খুব যত্নের সহিত বুরুষ দিয়ে ঘাড়ের ওপরেও সে একটি সিথী কেটেছিল। সেই ঘাড়টি নেড়ে হেলে দুলে সে আমাদের ঘর থেকে বেরুল। তার এই ধরণ দেখে আমার যেন কেমন কেমন

লাগ্‌তে লাগ্‌ল। লোকটির ওপর ঘৃণা আমার স্ত্রীর কাছে গোপন রাখলেও নিজের কাছে লুকিয়ে রাখতে পারিনি। যতক্ষণ সে ছিল ততক্ষণই বিরক্তিতে মনটা নেহাৎ তেতো হয়েই ছিল। ভাবলুম আমিই তার আসা বন্ধ করতে পারতুম, কিন্তু বন্ধ করার অর্থই তাকে ভয় করা। তাকে আমি মোটেই ভয় করি নি, তাই এগিয়ে গিয়ে তাকে বেহালা নিয়ে আস্‌তে আবার বললুম। সেও রাজী হয়ে চলে গেল।

"সন্ধ্যাবেলা সে কথামত বেহালা নিয়ে এল। আমার স্ত্রী আর সে একত্রে বাজাতে লাগ্‌ল, কিন্তু অনেকক্ষণ ধরেই একজনের বাজনা আর একজনের সঙ্গে বেশ খাপ খাচ্ছিল না। আমার স্ত্রী এত ওস্তাদ ছিল না যে তার সঙ্গে মিল করে বাজাতে পারে। আমি নিজেই বেহালার খুব ভক্ত ছিলুম, কাজেই তাদের দুজনের একত্রে বাজানোটাই চেয়েছিলুম। লোকটি বাজালে ভারি চমৎকার। বেহালায় তার ওস্তাদী খুবই প্রশংসার যোগ্য বটে, কিন্তু তার বাজনার মধুরতার সঙ্গে তার চরিত্রের কোনখানটিরই মিল ছিল না। আমার স্ত্রী যদিও খুব ভাল বাজাতে পারে নি তবুও সে তাকে খুবই প্রশংসা করে সৌজন্য প্রকাশ করলে। আমার স্ত্রী শুধু ঐ বাজানোতেই আগ্রহ প্রকাশ করলে, তার ব্যবহার খুব সরল এবং স্বাভাবিক বলেই বাইরে থেকে মনে হল। আমিও বাইরে দেখালুম যে, বাজানোতে খুবই প্রীতিলাভ করেছি, কিন্তু সমস্ত সন্ধ্যাবেলাটাই আমার মনটার ভেতরে অশান্তি ও বিরক্তির তীব্র আলোড়ন চলছিল।

"আমার প্রতি আমার স্ত্রীর বহুদিন থেকে ঘৃণা ও বিদ্বেষ বদ্ধমূল হয়ে আছে এইটি জেনেই আমার যন্ত্রণা ভয়ানক বেড়ে গিয়েছিল, কেবল আগ্নেয় পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাতের মত কিছু সময়ের জন্য চাপা থাকৃত এই যা। অন্যদিকে ঐ লোকটি দেখ্‌তে মন্দ ছিল না, তার

ওপরে সে নতুন, আর তার বাজাবার শক্তিও খুব বেশী, কাজেই তার দিকে আমার স্ত্রীর একটু টান হয়েছিল। এই সব কারণেও বটে, আর তারা যে কোন রকমেই হোক বাজাবার জন্য একত্রে জুটবেই, ঐ লোকটিও আমার স্ত্রীর মন জোগাবে, হৃদয় জয় করবেই, এসব ভেবেও আমি তার আসা বন্ধ করবার চেষ্টা করি নি। পরিণাম ভেবে আমি শিউরে উঠেছিলুম। কিন্তু কি করব? তাদের মেলা মেশা এখন বন্ধই বা করি কি করে? তার চেয়ে বরং মন জুগিয়ে চল্‌তে পার্‌লেই হয়ত বা কোন বিষম অনর্থ না ঘটতেও পারে; এই জন্যই ইহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে যে অতিশয় বিনয়ী হলুম তা নয়, লোকটির প্রতি মৌখিক ভালবাসাও খুব দেখাতে লাগলুম; কারণ, তাকে ভালবাসা দেখালে তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলে হয়ত আমার স্ত্রী আমার প্রতি একটু সদয় হতে পারে। যাই হোক তার প্রতি আমার ব্যবহার সরল ত একেবারেই ছিল না, স্বাভাবিকও নয়।

"তাকে খুন করবার ইচ্ছা যাতে আমাকে চঞ্চল করে না তোলে এই জন্য তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর্‌তে বাধ্য হয়েছিলুম। খুব টাকা খরচ করে ভাল ভাল খাবার আনিয়ে তাকে সেদিন খাওয়ালুম, প্রায়ই তাকে নেমন্তন্ন করতুম, তার বেহালায় একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেচি বলে তাকে জানাতুম, সব সময়েই একগাল হেসে তার সঙ্গে কথা কইতুম। কত রকমেই যে প্রীতি ও ভালবাসা, স্নেহ ও মমতা দেখাতুম তা আর বল্‌বার নয়। রবিবার দিন তাকে খেতে নেমন্তন্ন করে বল্‌লুম যে সন্ধ্যেবেলা আমার স্ত্রীর সঙ্গে তাকে বাজাতে হবে, আর আমার কয়েক-জন বন্ধুও তখন উপস্থিত থাক্‌বেন, তাঁরা সকলে এলে খুব ভাল মজলিস্‌ হবে, তাঁরাও নিশ্চয়ই প্রীতিলাভ করবেন। এতদিন ত এমনি ভাবেই কেটে গেল।"

তাঁর মনের আবেগ ও চঞ্চলতা এত বেশী হইয়াছিল যে তিনি আর বলিতে পারিলেন না। তাঁর গলাটা যেন ধরিয়া গিয়াছিল। মুখ ফিরাইয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া, আবার আমার দিকে ফিরিয়া বহু কষ্টে স্থির হইয়া বলিতে লাগিল,—

"লোকটা এলেই আমি যেন কি রকম অস্থির হয়ে যেতুম। তারপর তিন চার দিন কেটে গেচে। আমি প্রদর্শনী থেকে ফিরে এসেচি। আমার মনটা একেবারে দমে গেল যেন বুকের ওপরে একটা প্রকাণ্ড পাষাণের চাপ দেয়া হয়েছে। প্রথমটা এর কারণ কিছুই বুঝ্‌তে পারলুম না। হঠাৎ কেন এমন হল? কি আশ্চর্য্য! হঠাৎ আমার মনে হল যে বাইরের ঘরের ভিতর দিয়ে আস্‌বার সময় সেখানে এমন একটা কিছু দেখেচি যাতে সেই লোকটার কথা মনে পড়েচে। সেটা কি দেখ্‌বার জন্য তৎক্ষণাৎ বাইরের ঘরে গেলুম। আমার ভুল হয় নি, যা ভেবেছিলুম ঠিক তাই। দেখ্‌লুম তারই কোটটি সেখানে রয়েচে। কোট্‌টা দেখেই মনে একটা প্রবল সন্দেহ হল। চাকরকে জিজ্ঞেস্ কর্‌লুম, সেও বল্‌লে ঠিক তাই, সেই লোকটাই এসেচে। বৈঠকখানার ভেতর দিয়ে আমি আর নিজের ঘরে ঢুক্‌লুম না, ছেলেদের পড়্‌বার ঘরের ভেতর দিয়ে গেলুম। আমার মেয়ে তখন কি একটা বই পড়্‌ছিল, আর তার ধাইমা আমার সব চেয়ে ছোট ছেলেটাকে কোলে বসিয়ে সেলাইয়ের কাজ কচ্ছিল। আমার ঘরের যে দরজাটি বৈঠকখানার দিকে ছিল সেইটি একটু খোলা ছিল, আর সব দরজা বন্ধই ছিল। পিয়ানোর শব্দও আমি একটু একটু শোন্‌তে পেলুম, আর তাদের গলাও শোন্‌তে পাওয়া গেল। গলা শোনা গেল বটে, কিন্তু কথাগুলো বুঝতে পারা গেলনা। যাই হোক্ এটা বুঝ্‌তে বাকী রইলনা যে, পিয়ানোর আওয়াজ করা হচ্ছে তাদের কথা ঢাক্‌বার জন্য,

সম্ভবতঃ চুম্বনও। কি ভয়ানক! কি ভীষণ কল্পনাই আমাকে তখন উন্মত্ত করে ফেলেছিল। হিংস্র ব্যাঘ্রেরই মত একটা প্রবল হিংস্রপ্রবৃত্তি তখন আমার ভিতরে জেগে উঠ্‌ল। আজও তা মনে হলে চম্‌কে উঠি, শরীরটা শিউরে ওঠে।

"হঠাৎ আমাকে থাম্‌তে হল, বুকটার ভেতরে এমন টিবিস্‌ টিবিস্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল যেন কেউ একটা প্রকাণ্ড হাতুড়ি দিয়ে আমার বুকে খুব জোরে ঘা মার্‌চে। এই অবস্থায় আমার নিজের ওপরই দয়া হল। ভাব্‌লুম ছেলে মেয়ে আর তাদের শিক্ষয়িত্রীর সাম্‌নে এ কি কচ্ছি! আমার মুখের চেহারাটা খুবই ভীষণ হয়েছিল, কারণ মেয়েটা আমার মুখের দিকে যখন তাকালে তখন তারও মুখে চোখে একটা অব্যক্ত ভয় ফুটে উঠেছিল। ভাব্‌লুম কি করব এখন? ভেতরে ঢুক্‌ব? তাও ত পাচ্ছিনে। ভেতরে ঢুকে যে কি করব তা একমাত্র ভগবানই জানেন, কিন্তু ফিরে যেতেও পাচ্ছিনাত। শিক্ষয়িত্রীটিও আমার দিকে এমন ভাবে তাকালেন যেন তিনি আমার অবস্থা বুঝতে পেরেচেন।

"শেষটায় ভেতরে যাওয়াই স্থির করে ধাক্কামেরে দরজা খুলে ফেল্‌লুম। যা ভেবেছিলুম তাই, লোকটা পিয়ানো নিয়ে বসে আছে, আর আমার স্ত্রী পিয়ানোর পাশে রয়েচে, তাদের সামনে কয়েকখানি স্বরলিপি খোলা রয়েচে। আমার স্ত্রীই প্রথমে টের পেয়েছিল কিংবা আমায় প্রথম দেখ্‌তে পেয়েছিল, সে-ই ফিরে আমার দিকে তাকালে। তাকে বেশ স্থির বলেই মনে হয়েছিল, তবে তার খুব ভয় হয়েছিল অথচ বাইরে খুব শান্ত ভাব দেখাচ্ছিল অথবা তার কোনই ভয় হয় নি, তা বল্‌তে পারি না, কিন্তু এটা নিশ্চয় যে, জায়গা থেকে সে নড়ে নি। আমি ঢুক্‌লুম একেবারে হঠাৎ অথচ সে যেমনি ছিল তেমনি রইল, তবে তার মুখটা লাল হয়ে উঠ্‌ল। তাও প্রথমটা হয় নি, পরে হয়েছিল।

সে বল্লে, 'তুমি এসেচ, খুব ভালই হয়েচে। রবিবার দিন কি কি গৎ বাজাব তা এখনও ঠিক করতে পারি নি।' এত নরম এবং এমন ভালবাসার স্বরে সে কথা কয়েকটি বল্‌লে যে আমরা যখন একত্রে থাকি তখন তার মুখে এমন কথা ত শুনি না। এই ন্যাকামি আর 'আমরা' কথাটা অর্থাৎ সে আর ঐ লোকটা—আমার মেজাজটা চটিয়ে দিলে। লোকটি এসে আমার হাতে হাত দিলে, আমি কোন কথাই কইলুম না। যেন একটা বিদ্রূপের হাসি হেসে সে আমাকে বোঝাতে লাগ্‌ল যে, সে কতকগুলি স্বরলিপি নিয়ে এসেচে রবিবারে বাজাবার জন্য, কিন্তু কোন কোনটি সব চেয়ে ভাল হবে তা তারা কিছুতেই ঠিক করতে পারে নি, তাদের কিছুতেই মিল হচ্ছে না। কথাগুলো এত সরল ও স্বাভাবিক যে এতে আমি কোন দোষই দেখ্‌তে পেলুম না, অথচ এ বিশ্বাস আমার রয়েচে যে, সে যা বল্‌চে সবই মিথ্যে, আর আমাকেই ঠকাবার জন্য বোকা বানাবার জন্য এরা দুজনে একটা মৎলব এঁটেচে।

নারী ও পুরুষের ঘনিষ্ঠতম সংস্পর্শ আমাদের সমাজে চল্‌ছে। আমার মত সন্দিগ্ধ চিত্ত লোকের পক্ষে এর চেয়ে বেশী বিপদের অবস্থা আর হয় না। আমাদের সমাজের সকল পুরুষের অবস্থাই এই। নারী ও পুরুষের মেলা মেশারই দোষ বলচি না, আমি শুধু বলতে চাই এই রকমের মেলামেশা এবং একেবারে নিকটতম সংস্পর্শের কথা। বল্ নাচের সময় অপরিচিত পুরুষ ও নারীর যে সংস্পর্শ কিংবা শিল্পী চিত্রকর, গায়ক বাদক, পুরুষ ডাক্তার ও তার রোগিণীর যে রকম মেশামেশি হয়, তা যদি কেউ বন্ধ করতে চায়, দুনিয়া শুদ্ধ লোক তাকে নিশ্চয়ই পাগল বলবে।

"দুজনে একত্রে সঙ্গীত চর্চ্চা করে,—সঙ্গীত সব চেয়ে বড় জিনিষ,

শ্রেষ্ঠ শিল্প। এই শিল্পের চর্চ্চা করতে হলে ছুজনের নৈকট্য চাই-ই। এতে দোষের কিছুই নেই, আর নিতান্ত বোকা সন্দিগ্ধ-চিত্ত স্বামী না হলে তার স্ত্রীর এ রকম মেলামেশা কিছুই দোষের বলে মনে করে না। কিন্তু প্রত্যেকেই জানে যে এই মেলামেশায়, বিশেষতঃ এই রকমে সঙ্গীত চর্চ্চায়ই আমাদের দেশের খুব বেশীর ভাগ পাপের—ব্যাভিচারের সৃষ্টি হচ্ছে।

"আমি এটা বুঝতে পেরেছিলুম এবং বুঝতে পেরেই নিজেই হতভম্ভ হয়ে গিয়েছিলুম আর তারাও ছুজনেই চঞ্চল হয়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে আমি কোন কথাই কইতে পারি নি। একেবারে পূরোপূরি ভরা একটা বোতল হঠাৎ উল্টে বসালে যেমন জলটা বেরুতে পারেনা, আমার অবস্থাও ঠিক তেমনি হয়েছিল। ভেবেছিলুম তাদের গালাগাল দেব, লোকটাকে বাড়ী থেকে তাড়াব, কিন্তু একটু পরেই ভাবলুম আমার সৌজন্ত দেখানোই উচিত। আমি শিষ্টতাই দেখালুম। আমার মনের বেদনা যতই তীব্র হতে লাগল আমি ততই তাদের প্রত্যেকটি কথায় মুখে সায় দিয়ে গেলুম। বললুম সে যা ভাল মনে করে, তার কাছে যে সব গৎ খুব ভালো লাগে আমিও সেইগুলিই ভাল বলে বিশ্বাস করি, আমার স্ত্রীকে তাই করতে বললুম। হঠাৎ ঘরের ভেতরে ঢুকে এবং ঢোকবার পর নিশ্চল নির্ব্বাক হয়ে একটা নিতান্ত অপ্রীতিকর কাজ করেচি ; এ সময় আমার মনে একটা ভাল ধারণা জন্মবার জন্ত যতটুকু সময় তার থাকা দরকার ঠিক ততটুকু সময়ই সে রইল। তারপর সে বললে কি কি বাজানো হবে তা ঠিক হয়ে গেচে। সে উঠল, আমাকে যথেষ্ট ভদ্রতা দেখাতে হল। তার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর ফটক অবধি গেলুম। না গিয়ে করি কি ? যে আমার পারিবারিক জীবনের সমস্ত সুখ ও শান্তি নষ্ট করতে এসেচে, যার

উদ্দেশ্যেই আমার সর্ব্বনাশ করা তাকে শিষ্টতা ও ভদ্রতা না দেখিয়ে পারলুম না। কি যে করব কিছুই তখন বুঝতে পারিনি। খুব ভালবাসা দেখিয়েই তাকে ত সেদিনকার মত বিদায় করলুম।

২১

তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমি সমস্ত দিন আর আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা কইনি। কথা কইতে পারিনি। তার কাছে গেলেই এত ঘৃণা হত এবং ঘৃণা থেকেই এত রাগ হত যে, নিজেকে সাম্‌লাতে পার্‌ব কিনা এই ভয় হত। খাবার সময় হল। ছেলেমেয়েদের সামনেই আমাকে যেতে ডাক্‌লে, তখন আমি আমাদের সেই পল্লীগ্রামে যাওয়া ঠিক কচ্ছিলুম। অবিশ্যি আমাদের পল্লীসমিতির অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য পরের সপ্তাহে আমাকেই যেতে হত। স্ত্রীকে যাওয়ার তারিখটা বল্‌লুম। কোন জিনিসপত্তর সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে কিনা তাই সে আমায় জিজ্ঞেস্ করলে। আমি বলে দিলুম আমার কোন জিনিষেরই দরকার নেই। খেতে গেলুম, একটি কথাও খেতে বসে বলিনি, খাওয়াটি হলে তেমনি চুপ করেই আমার পড়বার ঘরে উঠে গেলুম। হালে সে আর আমার ঘরে আসত না বিশেষতঃ এই সময়ে। আমি একটু শুয়ে রইলুম, আমার ভয়ানক রাগ হতে লাগল। তখন একটা বীভৎস ধারণা হঠাৎ আমার মাথায় ঢুকল। সে যে অনভ্যস্ত সময়ে আমার কাছে আস্‌ত তার উদ্দেশ্য হচ্ছে পাপ গোপন করা। তার পায়ের শব্দ শোন্‌তে পেলুম। ভাবলুম সে কি সত্যই আমার কাছে আস্‌চে? যদি তাই হয়, তা হলে যা ভেবেচি নিশ্চয়ই তাই। শব্দ ক্রমাগত কাছেই শোনতে পাওয়া গেল; কাছে আরও কাছে।

যাক্ সেত আমার ঘরের পাশ দিয়েই বৈঠকখানা ঘরে যাবে। দেখ্লুম হঠাৎ আমার ঘরের দরজাটি খুলে গেল আর চৌকাটের ওপরে তার দীর্ঘ ও সুগঠিত সুন্দর দেহখানি নিয়ে সে দাঁড়িয়ে। তার চোখে মুখে এমন সলজ্জ সঙ্কোচ এবং এমন একটা ভাব যা আমার অনুগ্রহ চায়, আমার সুনজর চায়। তার ইচ্ছা আমার কাছে গোপন রইল না, আমি ঠিক বুঝতে পারলুম। রাগে যেন আমার দম আট্‌কে আস্‌তে লাগ্‌ল। তার দিকে কটমটিয়ে চেয়ে চুরুট বের করে টান্‌তে লাগ্‌লুম।

"আপনি ভাব্‌চেন এ কি রকম? একজন লোক কাছে বসে দুটো কথা কইতে এসেচে আর আমি চুরুট বের করে টান্‌চি! সে আমার কাছে এসে বস্‌ল, আমি একটু দূরে সরে গেলুম পাছে আবার তাকে ছুঁই। সে অমনি বল্‌লে—'আমি রবিবার বাজাব বলে তুমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েচ দেখ্‌তে পাচ্ছি।'

"আমি বল্‌লুম, 'না, আমি মোটেই বিরক্ত হই নি।'

"তুমি কি মনে কর যে আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে!"

"তোমার বুঝ্‌তে পারার ক্ষমতায় আমি খুব আনন্দিত, কিন্তু আমি যা দেখ্‌তে পাচ্ছি তা এই যে তোমার ব্যাভিচারিণীর মত।"

"ছিঃ ছিঃ তুমি যদি আমায় অমন কথা বলে আমার নিন্দে কর আমি চলে যাব।'

"স্বচ্ছন্দে যাও, কিন্তু এইটি মনে রেখো আমার এই বংশের—এই পরিজনবর্গের মর্য্যাদা যদি তোমার কাছে প্রিয় না হয়, তুমিও আমার কাছে প্রিয় নও, সম্মান সব চেয়ে বড়। তুমি চুলোয় যাও।"

"কি বল্‌চ তুমি?"

"তুমি বেরোও আমার ঘর থেকে, বেরোও বল্‌চি।"

"আমার কথা বুঝ্‌তে না পারার ভাণ করলে, কি কর্‌লে না তা আমি জানিনে। কিন্তু সে চটে গেল, দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল, কিন্তু গেল না, ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়েই রইল, বল্‌লে, 'তোমার ব্যবহার নিতান্তই অসহ্য হয়ে উঠ্‌ল, তোমার যা চরিত্র তাতে মানুষও ছার, দেবতা পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে থাক্‌তে পারে না।' তারপর বরাবর যেমন তার অভ্যাস, তেমনিই আমার আঁতে ঘা মেরে বল্‌লে আমি আমার ভগ্নীর সঙ্গে কি ভয়ানক দুর্ব্যবহার করেছিলুম। সত্যই একদিন কি রকম রাগে অন্ধ হয়ে আমার ভগ্নীকে অত্যন্ত কর্কশ কথা বলেছিলুম, তা মনে হলেই দুঃখে-যন্ত্রণায় আমার বুকটা যেন ভেঙে যায়। আমার হৃদয়ের ক্ষত মুখটি বের করে সে আঘাত করলে। বল্‌লে—'যে যে নিজের বোনের সঙ্গে অমন ব্যবহার করতে পারে সে যে আমার সঙ্গে কর্কশ ব্যবহার করবে তা মোটেই বিচিত্র নয়।' সে শুধু আমাকে খোঁচা মেরে, অপমান করতে খুসী হয়নি, উল্টে সে জানাতে চাইলে যে সবই আমার দোষ। এই ভেবে তার ওপর যা ঘৃণা তখন হল তা আমার জীবনে আর কখনো হয় নি। নিজেকে আর সাম্‌লাতে পার্‌লুম না, ইচ্ছা হল কয়েকটা মেরে ঠাণ্ডা করে দেই। আমি তাকে ধর্‌তে গেলুম। আমার এখনও মনে আছে তখন একটু থেমে ভাব্‌লুম ক্রোধের বশ হয়ে এটা কি ভাল কাজ কচ্ছি। এতে ওকে ভয় খেতেই হবে। স্ত্রীকে ভয় দেখাবার জন্য আমি আর ক্রোধ দমন করবার চেষ্টা করলুম না, বরং ক্রোধের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটা উৎকট আনন্দও বোধ করলুম। তার কাছে গিয়ে হাতটা ধরে চেঁচিয়ে বল্‌লুম, 'বেরিয়ে যাও এখান থেকে, নইলে তোমায় খুন করব।' রাগ দেখাবার জন্য গলাটা যতদূর চড়িয়ে দেওয়া সম্ভব ততটাই চড়িয়ে দিয়েছিলুম, আর আমার মুখের চেহারা-টাও নিশ্চয়ই দেখ্‌তে খুব ভীষণ হয়েছিল। সে ভয়ে এতই আড়ষ্ট

হয়েছিল যে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার শক্তিও তার ছিল না। সে শুধু ছেলেকে উদ্দেশ করে বল্‌লে, তোর কি হয়েছে রে খোকা ?' আমি চেয়েও জোরে চীৎকার করে বললুম, বেরোয় বল্‌চি এখনও, আমায় কি পাগল করে দিতে চাও ? বল্‌তে পাচ্ছি না কি কাণ্ড করে ফেল্‌ব।'

"এক একবার ইচ্ছা হচ্ছিল যে একটা ভয়ানক কাণ্ড করে বসি, ধরে ভয়ানক মারি বা একেবারেই খুন করে ফেলি। কিন্তু তখনও আমার এ জ্ঞানটুকু ছিল যে তা হবার উপায় নেই। কি করি ? আর ত সহ্য করা যায় না। টেবিলের ওপর একটা কাগজ চাপা ছিল সেইটি তুলে বেরো বলে চেচিয়ে উঠে তার পায়ের কাছে মাটিতে ছুড়ে ফেললুম। যাতে আর গায়ে না লাগে সেটি লক্ষ্য রেখেই মেরেছিলুম। সে ঘর থেকে বেরুল বটে কিন্তু চৌকাটের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল! আমি তখন টেবিলের ওপর যা ছিল—কালির বোতল বাতি দান ইত্যাদি সবই মেজেতে ছুড়ে ছুড়ে ফেলে ক্রমাগত বল্‌তে লাগলুম—দূর হও কি বিষম কাণ্ড করে ফেল্‌ব বল্‌তে পাচ্ছিনে।' সে বেরিয়ে গেল, আমিও চুপ করলুম। এক ঘণ্টা পরেই ঝি এসে খবর দিলে আমার স্ত্রী অজ্ঞান হয়ে পড়েচে। ছুটে তার ঘরে গেলুম, দেখলুম সে কখনো হো হো করে হাস্‌চে, কখনো বা কাঁদচে, কিন্তু কথা কইতে পাচ্ছে না, আর তার সমস্ত শরীর খুব প্রবল ভাবে কাঁপচে। এ ভাণ নয়, সত্য সত্যই তার অসুখ, সে একেবারেই বেহুস।

"ভোর হয়-হয় এমন সময় সে সুস্থ হল। দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে আবার 'মিলন' ঘটানো' হল। ভোর হলে আমি স্বীকার করলুম টুন্নার ওপর ঘোর সন্দেহ আছে। একথা শুনেও সে একটুও চঞ্চল হল না, বরং খুব স্বাভাবিক হাসিই হাস্‌লে এবং বল্‌লে যে সে রকম

লোকের ভালবাসা জন্মাবার কথাটা তার কাছে নিতান্তই অদ্ভুত ঠেকেচে।

"বাজনা বাজিয়ে খুসী করা ছাড়া টুমার মত একটা সামান্য লোক একজন সম্ভ্রান্ত মহিলার মনে আর কি ভাব জন্মাতে পারে? ঠিকই ত! আমার স্ত্রীও বল্‌লে, 'সে বাজায় আমিও বাজাই এই পর্য্যন্ত এতে ভালবাসার কথা আসে কি করে? তা তোমার যদি ইচ্ছা হয় আমি আর তার সঙ্গে দেখা কর্‌ব না, রবিবারেও না, যদিও সেদিন আমাদের অনেক বন্ধুকে আস্‌বার জন্য নেমতন্ন করা হয়েচে। আমি নিজেই লিখে জানাব যে আমার অসুখ, ব্যস্‌। ফুরিয়ে গেল। শুধু একটু আশঙ্কার কারণ আছে যদি কেউ বলে যে তাকে সন্দেহ করা হয়েচে, তার দ্বারা বিপদের আশঙ্কা আছে বলে মনে হয়েচে তা হলে সে রেগে যাবে। তা আমি কাউকে সন্দেহ কর্‌তেও দেবনা, এ গর্ব্বটুকু আমার আছে। একথা মিছে বলে মনে হল না, সে যা বল্‌চে সরল বিশ্বাসেই বল্‌চে। তা ছাড়া লোকটার প্রতি তার ঘৃণাই জন্মাবে এবং তার আক্রমণ থেকে সে নিজেকে রক্ষা করেই চলবে—এ কথাও বললে। কিন্তু সে তা পারলে না সব জিনিষই, বিশেষতঃ এই গানবাজনা তার এ ভাবের বিরোধী হয়েছিল।

এই রকম করে ত এই ব্যাপারটি শেষ হল। রবিবারে বন্ধুরা সমবেত হলেন। আমার স্ত্রীও তার সেই আগেকার বন্দোবস্ত অনুসারেই বাজালে।

তিনি একটু চঞ্চল হইয়া পড়িলেন, কিন্তু এই চঞ্চলতা বেশীক্ষণ রহিল না। স্থির হইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,—"আমার মনে সুখ ছিল না, যা কিছু কচ্ছিলুম সবই শুধু একটা ভড়ং। জীবনটাও এমনি হয়ে পড়েছিল যে ভড়ং ভিন্ন চলাও অসম্ভব। রবিবার দিন বন্ধুদের জন্য ভাল ভাল খাবার যোগাড় করা এবং বাজনায়ও যাতে সকলে খুসী হয় তারও সুবন্দোবস্ত করার কোন ত্রুটিই করিনি। খাবারের জিনিষ কিনতে এমন কি আমি নিজেও বাজারে গিয়েছিলুম। সকল বন্ধুকেই আমি নিজে অভ্যর্থনা করলুম। ছটার সময়ে তাঁরা সকলেই এলেন, সে লোকটাও এল। তাকে বেশ ধীর স্থির বলেই মনে হল। সে প্রত্যেক কথায়ই হেসে সম্মতি জানিয়ে তাড়াতাড়ি উত্তর দিতে লাগল আর তার উত্তরের ভাব এই যে, যা যেমনটী বলা বা করা হচ্ছে ঠিক তেমনটিই যেন তার মনের মত। তার যা কিছু বিশেষত্ব তা সেদিন সন্ধ্যেবেলা আমার নজর এড়ায়নি। আমি লক্ষ্য করে বুঝে-ছিলুম সে কি দরের লোক। আমার বেশ ধারণা হল যে আমার স্ত্রীর চেয়ে সে ঢের হীনপদস্থ লোক। আমার স্ত্রী এতটা হীন হতেই পারে না যে ওর সঙ্গে তার ভালবাসা জন্মাবে। আমার মন থেকে সন্দেহ দূর করতে চেষ্টা করলুম। সন্দেহ ও ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে গিয়ে চরম সীমায় পৌছেচি, এখন সে সব দূর করে মনটা শান্ত করার দরকার। এখন চাই একটু শান্তি একটু বিশ্রাম। স্ত্রীর কথাও তখন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হ'ল, বিশ্বাস করলুমও, তবুও তার সঙ্গে এবং আমার স্ত্রীর সঙ্গে খাবার সময় সরল স্বাভাবিক ব্যবহার করতে পারলুম না। শুধু

খাবার সময়েই নয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না বাজনা আরম্ভ হল ততক্ষণ এই ভাবেই কাট্‌ল। আমি ক্রমাগত তার এবং আমার স্ত্রীর ধরণ ধারণ, চাউনি, কথাবার্ত্তা লক্ষ্য কচ্ছিলুম। আমাদের ভোজের ব্যাপারটা নিতান্তই বিরক্তিকর বোধ হয়েছিল। ভোজের পর খুব শীঘ্রই বাজনা আরম্ভ হল।

"প্রত্যেকটি নিতান্ত ছোটখাটো ব্যাপারও আমার পরিষ্কার মনে আছে। তাদের ভাব ভঙ্গী খুব নজর করে দেখ্‌ছিলুম, তা যত তুচ্ছই হোক্‌ না, কি রকম করে সে বেহালাটা নিয়ে এল; বেহালার বাক্সটার ওপরে মেয়েলী হাতের তৈরি একটি ভাল ঢাক্‌নী ছিল তা কি রকম করে সে খুল্‌লে, আর বেহালাটি বের করে সুর দিতে লাগ্‌ল। আমার স্ত্রীও পিয়ানোর কাছে গিয়ে বস্‌ল, সেও খুব ধীর ও স্থির ভাবেই রইল বটে, কিন্তু নিজের ক্ষমতার সন্দেহটা চাপা চেষ্টা কচ্ছিল, তার একটু ভয় হয়েছিল। যাই হোক্‌, তারা বাজাতে আরম্ভ কর্‌লে, আসরটা জমাবার জন্য খানিকক্ষণ এটা ওটা বাজালে। তারপরে দুজনেরই চোখো-চোখি হল, তারা সমাগত শ্রোতাদের দিকে চেয়ে ঐক্যতান বাজাতে আরম্ভ করলে। ট্রুখাই প্রথমে ধর্‌লে, তার মুখখানা তখন গম্ভীর এবং কঠোর অথচ সহানুভূতিতে ভরা। বেহালার তারের ওপর দিয়ে খুব সতর্কতার সহিত আঙ্গুল চালিয়ে সে বাজাতে লাগ্‌ল, আর পিয়ানোও তার সঙ্গে সঙ্গে চল্‌তে লাগ্‌ল।"

পজ্‌নিশেফ্‌ একটু থামিয়া কি রকম এক অদ্ভুত শব্দ করিলেন। তাঁর কাহিনী আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু পারিলেন না, তাঁকে থামিতে হইল। তাঁর মনের আবেগ রুদ্ধ করিয়া একটু সুস্থ হইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,—

"তারা ত বাজাতে লাগ্‌ল। সে আশ্চর্য্য জিনিষ। গান বাজনা

জিনিষটাই ভারি আশ্চর্য্য। সঙ্গীত জিনিষটা কি আমি ঠিক বুঝ্তে পারিনে। এর উপকারিতাই বা কি? এতে লোকের কি উপকার আমরা দেখতে পাচ্ছি?

"লোকে বলে সঙ্গীতে আত্মার উন্নতি হয়। ভুল, অন্ততঃ আমার বেলায় ভুল। কোথায় আত্মার উন্নতিটা হয়? আত্মশুদ্ধি ত কিছুই দেখ্তে পেলুম না। আমার মনের কথা আমি কি করে বোঝাব? ভাষা ত পাচ্ছিনে। সঙ্গীত মানুষকে আত্মভোলা করে, তাকে এমন একটা অবস্থার ভিতরে নিয়ে যায় যা তা নিজস্ব নয়। আমার মনে হয় যেন যা আমার শক্তির বাইরে তাও করতে পারি; কি রকম একটা উত্তেজনা আসে। সঙ্গীত আমার কাছে যেন 'হাই তোলা আর হাসির মত, অর্থাৎ যখন অন্যকে হাই তুলতে দেখি ঘুম না পেলেও আমি হাই তুলি আর অন্যকে হাসতে দেখলেও হেসে ফেলি। সঙ্গীত রচনার সময় কবি যে ভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন আমিও যেন সেই ভাবের মধ্যে ডুবে যাই, আমার আত্মা যেন তাঁর আত্মার সঙ্গে মিশে যায় এবং তাঁরই সঙ্গে মনের এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থায় চলে যাই। কেন যে এ রকম হয় জানি নে। কবি যে ভাবে মুগ্ধ হয়ে গান রচনা করেন তাঁর কাছে তাঁর মনের সে অবস্থার একটা অর্থ আছে, একটা সার্থকতা আছে, কারণ তাঁর সেই ভাব কতকগুলি বিশিষ্ট কাজে তাঁকে প্ররোচিত করে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু আমার কাছে? সঙ্গীত আমার কাছেত অর্থ হীন, শুধু একটু ক্ষণিক উত্তেজনা ছাড়া এতে আর কিছুই হয় না। যার যে প্রবৃত্তি সেই প্রবৃত্তিই এতে উত্তেজিত হয়। বদ লোকের বদ প্রবৃত্তিই এতে উত্তেজিত হয়। সৈন্যদল যুদ্ধে চলেছে, বাজনা বেজে উঠল, তালে তালে পা ফেলে ফেলে তারা চলতে লাগল, যে উদ্দেশ্যে এই বাজনা বেজে উঠল তা

সার্থক হল। যদি নাচের বাজানো হয় কিংবা নাচের গান গাওয়া হয়, অমনি নাচ আরম্ভ হয়, যাদের দেহ নাচে না, তাদের নাচে মন। যে উদ্দেশ্যে গীর্জ্জায় প্রার্থনা-সঙ্গীত গাওয়া হয় এবং বাজানো হয় তাও ব্যর্থ হয় না। কিন্তু অন্য সব গান বাজনায় কি হয়? উত্তেজনা একটু হয় বটে, কিন্তু কিসের জন্য? কি উদ্দেশ্যে? যেখানে উদ্দেশ্যই শুধু ভোগ, শুধু ফূর্ত্তি, উদ্দাম প্রবৃত্তির তৃপ্তিসাধন, সেখানে সঙ্গীতের ফল অতি ভয়ানক। সঙ্গীতের একটা মাদকতা আছে একটা সম্মোহন শক্তি আছে। যদি অত্যন্ত দুশ্চরিত্র কোন লোক কুৎসিত লিপ্সা চরিতার্থ করবার জন্য এই সম্মোহন অস্ত্র ধারণ করে, তাহলে তার ফল কি হয়?

"যারা ব্যবহার করতে জানে তাদের হাতে এ একটা ভয়াবহ অস্ত্র। আমার বাড়ীতে যে সঙ্গীতের বৈঠক হয়েছিল দৃষ্টান্ত স্বরূপ সেইটিই ধরা যাক। যে বিশেষ গৎটি আমার বৈঠকখানায় বাজানো হয়েছিল সেটা অত্যন্ত উত্তেজক এবং অশ্লীল গানের সুর। সে সুর সকলেরই বিশেষ পরিচিত। সকলেই সেদিন প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিল। সেখানে দু'চারজন মহিলাও ছিলেন। মহিলাদের সামনে অশ্লীল গান গাওয়া, তার প্রশংসা করা কি আত্মার উন্নতি প্রকাশ করে? যাক্, যেমন একটি ঐক্যতান বাজানো হয়ে গেল অমনি তখন সকলেই এক কেলেঙ্কারীর ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করে দিলে। তারই কিছুদিন পূর্ব্বে এই ব্যাপারটি ঘটে ছিল, সেই কুৎসিৎ ঘটনার আলোচনা খানিকক্ষণ চলল। কুপ্রবৃত্তির ইন্ধন জোগান ছাড়া এ আর কি হতে পারে? সঙ্গীতের একটা উদ্দেশ্য ত আছে। যে উদ্দেশ্যে সঙ্গীতের সৃষ্টি সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাজ করা ত চাই। সেই কাজে উৎসাহিত ও উত্তেজিত

হওয়ার জন্য সঙ্গীতের দরকার। কিন্তু যেখানে উদ্দেশ্যহীন উত্তেজনা, সেখানে? সেখানে এর ফল খারাপ না হয়ে পারে কি?

"যাই হোক্ আমি সেদিনকার কথা বল্‌চি। আমার ওপরে এক প্রভাব খুব বেশীই হয়েছিল। স্বপ্নেও যা কোন দিন ভাবিনি এমন সব জিনিষের ধারণা আমার সমস্ত মন একেবারে তোলপাড় করে দিলে। আমার অন্তর থেকে কে যেন চুপি চুপি বললে—এই রকম ভাবেই আমাকে বেঁচে থাকতে হবে, এতদিন যে ভাবে জীবন চালিয়েচি সে ভাবে নয়। এই যে একটা নতুন ধারণা, নতুন জ্ঞানলাভ হল, এর যে কি উদ্দেশ্য তা ঠিক আমি বুঝতে পারিনি, কিন্তু নতুন অভিজ্ঞতা একটা হল—এইটিই আমার প্রাণে একটা আনন্দ এনে দিলে। আমার স্ত্রী আর সে, অন্য সব শ্রোতাও বটে, সম্পূর্ণ উৎফুল্ল হয়েছিল, তাদের মুখ আনন্দে জ্বল জ্বল কচ্ছিল। তারপরে অনেক ঐক্যতান বাজানো হল। কিন্তু প্রথমটীর মত আর কোনটীই আমাকে এত প্রফুল্ল করতে পারে নি। সে রাত্তিরে আমার ভারি আনন্দ হল। সে রাত্তিরে আমার স্ত্রীকে যেমন দেখেচি আর কোন দিন তাকে তেমনটি দেখিনি—তার সেই উজ্জ্বল চোখ দুটি, তার মুখের শান্ত মধুর গাম্ভীর্য্য, স্নিগ্ধ মাধুর্য্য আর তার সেই মৃদুমন্দ মিষ্টি হাসিটুকু। ভাবলুম আজ আমারই মত তারও মনের অবস্থা, আমারই মত তারও এই নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন ভাব, নতুন অনুভূতি, আর আমারই মত আনন্দে তার সমস্ত দেহ ও মন উৎফুল্ল। সেদিনকার সঙ্গীতের বৈঠক শেষ হল, আমার অভ্যাগতরা একে একে আমাদের 'শুভরাত্রি' কামনা করে বিদায় গ্রহণ করলেন।

দুদিনের ভেতরেই আমাকে আমাদের পল্লীগ্রামে একটা বিশেষ কাজের জন্য যেতে হবে শুনে, বিদেয় নেওয়ার সময় টুখা বললে যে, এর পরে সে আবার এই রকম আনন্দ আমায় দেবে। আমার অনু-

পস্থিতিতেও সে আমার বাড়ীর ভেতরে ঢুকবে—এটা অসম্ভব মনে করে আমি খুসী হলুম। এটাও জানা ছিল যে, তার মস্কো থেকে কয়েক দিনের মধ্যেই চলে যাবার কথা, আর আমারও তার যাওয়ার পূর্ব্বে ফিরে আসবার সম্ভাবনা একেবারেই ছিল না; সুতরাং তার সঙ্গে আর দেখা হওয়ার কোন আশাই ছিল না। তাই এই প্রথম নিতান্ত অকপটভাবে তার করমর্দ্দন করে তাঁকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিলুম। আমার স্ত্রীর কাছেও সে শেষ বিদায় গ্রহণ করলে। তার এবং আমার স্ত্রীর বিদায় নেওয়া এবং দেওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রকমের মনে হল। তাতে কিছুই সন্দেহের ছিল না। আমরা দুজনেই সে রাত্তিরটা খুব আনন্দেই কাটিয়ে দিলুম।

২৩

তিনি বলিলেন, "দু' দিন পরেই আনন্দ-ভরা মনে স্ত্রীর কাছে বিদায় নিয়ে আমি আমাদের পল্লীগ্রামে গেলুম। যখনই সেখানে যেতুম তখনই আমাকে ঢের কাজ করতে হত। সহরের চেয়ে এখানকার জীবন অনেকটা হলেও যেন নতুন জীবন পেলুম। কাজের আনন্দে বেশ দুটি দিন কেটে গেল। যেদিন সেখানে গেচি তারপর দিন বসে কাজ কচ্ছি এমন সময় আমার স্ত্রীর কাছ থেকে একখানা চিঠি এল। তখনই চিঠিখানা খুলে পড়তে আরম্ভ করলুম। ছেলে, মেয়ে, ধাইমা, নতুন যেসব জিনিষ কিনেচে সেই সব, আরও এটা ওটা সম্বন্ধে সে লিখেচে। চিঠির শেষে লিখেচে, যেন এটা একেবারেই তুচ্ছ ব্যাপার ট্রুখা যে সব স্বরলিপি নিয়ে অ'সবে বলে আমায় কথা দিয়েছিল তা সে এনেছিল, বাজাতেও চেয়েছিল কিন্তু আমি রাজী হইনি।' ট্রুখা যে এরকম

কোন কথা দিয়েছিল তা আমার মনেই পড়ল না, তা ছাড়া আমি জানতুম সে মস্কো ছেড়ে চলে গেচে। কাজেই এই সামান্য খবরটুকু আমার কাছে নিতান্ত অপ্রীতিকর বোধ হল। তখন আমার হাতে এতই কাজ ছিল যে এ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় ছিল না। সন্ধ্যাবেলা সে দিনের সব কাজ সেরে যখন আমার ঘরে ঢুকলুম তখন চিঠিখানা খুলে আর একবার পড়লুম। আমি বাড়ীতে নেই তবুও ট্রুখা আমার বাড়ীর ভেতরে ঢুকেচে। সমস্ত চিঠিটাই আমার কাছে একটা দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকা বলে মনে হল। আমার মনে আবার সেই সন্দেহ জেগে উঠল। গহ্বরে শায়িত সুপ্ত সিংহ গর্জ্জন করে উঠল। আমি তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দিলুম।

"ভাবলুম এই সন্দেহ কি ঘৃণিত জিনিষ। স্ত্রী যা লিখেচে তার চেয়ে স্বাভাবিক ও সরল কথা আবার কি হতে পারে; এতে সন্দেহ কিছুই নেই। তারপর দিন আমায় কি কি কাজ করতে হবে বিছানায় শুয়ে তাই ভাবতে লাগলুম। যে কয়েকদিন আমাদের সমিতির বৈঠক হল সে কয়েকদিন আমার খুব শীঘ্র শীঘ্র ঘুম পেত না, আর অপরিচিত ঘরে সহজে ঘুম আসেও না। যাক্ সে রাত্রে শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়লুম।

"হঠাৎ এক ধাক্কা লাগলে যেমন হয় আমারও ঠিক তাই হল, আমি হঠাৎ জেগে উঠলুম। স্ত্রীর কথা, তার প্রতি আমার ভালবাসার কথা, আর সেই ট্রুখার কথা, সব এক সঙ্গে মাথায় ঢুকল। ভয় এবং ক্রোধ যেন আমার ভেতরটা একেবারে ভেঙ্গে চুড়ে গুঁড়িয়ে দিচ্ছিল, তবুও ভাবতে লাগলুম—আবার আমার সন্দেহ, এ নিতান্তই হাসির ব্যাপার এ সন্দেহের কিছু মাত্র ভিত্তি নেই, স্ত্রীকেই বা এতটা হীন মনে করি কি করে? এক দিকে একটা অতি সাধারণ লোক,

পেশাদার বেহালা বাজিয়ে, বদলোক বলেই পরিচিত, আর একদিকে সমাজে পদস্থ একজন উচ্চশ্রেণীর মহিলা, একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের স্ত্রী আর পাঁচ পাঁচ জন সন্তানের স্নেহশীলা জননী! এও কি হয়? একেবারেই অসম্ভব। আমার স্ত্রীরই আত্মমর্য্যাদা আত্ম-সম্মান বলে কোন জিনিস নেই, আর সেই ভবঘুরে লোকটারই কি এত সাহস হতে পারে? এই ত গেল একদিকার কথা। অপর দিকটাও ভাবলুম,—এটা ত অস্বাভাবিক নয়, এ রকম যোগাযোগ হলেও হতে পারে মনে করাটাই কি একেবারে ভুল? এটা কি একেবারেই অসম্ভব? লোকটা বিয়ে করে, খায় দায় ভাল, চেহারাটাও সুশ্রী, কোন একটা ভাল আদর্শ নিয়ে চলে না; তা ছাড়া তার বিশ্বাস যে আনন্দের বস্তু, উপভোগের বস্তু ভোগ করাই উচিত, তা যাই হোক্ না সে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিচার করা চলে না। এই লোকটি আর আমার স্ত্রীর মধ্যে মেলা মেশার, ঐক্যের বন্ধনও ত একটা রয়েছে—ঐ সঙ্গীত আলাপন। একত্রে সঙ্গীত চর্চ্চার ভদ্রতা, শিষ্টতা ও সভ্যতার গণ্ডী। তার গণ্ডী যে ভাঙবে না এরকম বিবেচনা করবার কারণটাই বা কি আছে? বরং প্রলুব্ধ হওয়ার তার যথেষ্ট কারণ আছে। আর আমার স্ত্রী? সে-ই বা কি? সে যেমন পূর্ব্বেও আমার কাছে একটা রহস্য ছিল এখনও তেমনি রহস্যই আছে। তাকে ত আজ অবধিও চিন্‌তে পারলুম না। শুধু এইটুকুই জানি যে তার প্রবৃত্তি প্রবল। যার প্রবৃত্তি প্রবল তাকে ত কেউ বাধা দিতে পারে না, সেত কোন বাধাই মান্‌বে না।”

“রবিবারে আমাদের বৈঠকের পর এই কথাগুলো ভাবতেই তাদের হাবভাব, কথাবার্ত্তা একে একে মনে পড়তে লাগল। প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি কথা, চালচলন নিয়ে মাথাটা নিতান্তই ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

তাদের মুখে যেন একটা ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছিল। ভাবলুম—আমি চলে এসে কি ভয়ানক বোকামিই করেচি! সেদিন কি এটা দিনের আলোর মত স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় নি যে তাদের মিলনের মাঝখানে আর কোন বাধা নেই? তাদের দুজনের ভিতরে এমন একটা কিছু হয়েচে যা মনে হওয়াতেই দুজনেই বিশেষতঃ আমার স্ত্রী, যে একটু লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হয়ে প'ড়েছিল এটাও কি স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়নি। আমি যখন আমার স্ত্রীর পিয়ানোর কাছে গিয়েছিলুম তখন তার লজ্জিত রক্তিম মুখখানার যে ঘাম মুছে ফেল্‌ছিল, আর কি রকম আনন্দের ও সুখের ক্ষীণ হাসির রেখা তার ঠোঁটে খেল্‌ছিল। তাদের দুজনের চোখাচোখি তারা ইচ্ছা করেই বন্ধ করেছিল, কেবল ভোজের সময় সে যখন আমার স্ত্রীর গ্লাসে খানিকটা জল ঢেলে দিচ্ছিল, তখন দুজনের চোখাচোখি হয়েছিল। তাদের মুখের ভাবটি মনে হওয়ায় আমি শিউরে উঠলুম। আমার মনে হল তাদের সব কল্পনা বাস্তবে পরিণত হয়েছে, তাদের ইচ্ছা পূর্ণ হয়েচে। আবার মনে হল আমি আধ পাগল। এ হতেই পারে না। ঘরে একেবারে জমাট বাঁধা অন্ধকার। এই অন্ধকারে শুয়ে থাকলে এই সংশয় আর এই ভীষণ চিন্তা আমাকে একেবারে চেপে ধরবে এই ভেবে একটা দেশলাই জ্বাল্‌লুম, ঘরটার চারদিকে একবার তাকালুম, আমার ভয়ানক ভয় হল। দুর্ভাবনার সময়ে যেমন সাধারণতঃ হয়ে থাকে তেমনি আমারও হল, আমি চুরুট ধরালুম। মাথা থেকে ভাবনার বোঝা নামাবার জন্য একটার পর একটা চুরুট পোড়াতে লাগলুম। রাত্রে আর ঘুমুতে পারলুম না। ভোর পাঁচটার সময়ে স্থির করলুম এমনি করে মাথা খুঁড়ে আর যন্ত্রণা ভোগ করব না। বিছানা ছেড়ে উঠে বাইরে গিয়ে দরোয়ানকে ডেকে গাড়ী ডাকতে পাঠালুম। আমাদের সমিতির নামে

একখানা চিঠিতে লিখলুম যে বিশেষ দরকারে হঠাৎ আমাকে মস্কো যেতে হচ্ছে, আমার কাজটা যেন সমিতির অন্য কোন সভ্য অনুগ্রহ করে করেন। তারপর বেলা আটটার সময় গাড়ীতে চেপে মস্কোর দিকে রওনা হলুম।”

এক রেল কর্ম্মচারী আমাদের গাড়ীতে আসিয়া ঢুকিলেন। আমাদের গাড়ীতে যে বাতিটা জ্বলিতেছিল সেটা পুড়িয়া পুড়িয়া একেবারে তলায় গিয়া ঠেকিয়াছিল। একটি ফুঁ দিয়া তিনি সে বাতিটা নিভাইয়া দিলেন, আর আলো দিলেন না। তখন ভোর হইয়া আসিতেছিল। পজ্‌নিশেফ চুপ করিয়া রহিলেন, যেন তাঁর বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া মাঝে মাঝে এক একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইতেছিল। রেল কর্ম্মচারী বাহির হইয়া গেলেন। আমরা খানিকক্ষণ অন্ধকারেই বসিয়া রহিলাম। গাড়ীর জানালা খোলা আর বন্ধ করার শব্দ এবং ট্রেণের প্রচণ্ড ঘড়্ ঘড়্ শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাইতেছিল না।

ভোরবেলার নিতান্ত ঘোলাটে আলো পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছে; কিন্তু গাড়ীর ভিতরে তখনও পজ্‌নিশেফের মুখখানা স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম না। না পাইলেও তাঁর স্বর যতই চঞ্চল এবং করুণ হইয়া আসিতেছিল তাঁর গলার জোরও ততই বাড়িতেছিল।

তিনি বলিলেন, “তিরিশ মাইল পথ গাড়ী করে এসে ট্রেণ ধরলুম। ট্রেণেও আট ঘণ্টা লাগল। তখন কুয়াশায় ঢাকা শরৎকালের সকাল বেলা, সূর্য্যের আলো স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল, রাস্তা সুন্দর মসৃণ। কাজেই গাড়ীতে তিরিশ মাইল ভ্রমণ আমার কাছে খুবই মনোরম হইয়াছিল। যেমনি ভোর হল আমিও অমনি বেরুলাম। বেরিয়ে মনটা একটু হাল্কা হল। চারিদিকের সুন্দর সুন্দর মাঠ, বন, লোকজন দেখতে

দেখতে কোথায় যাচ্ছিলুম ভুলেই গিয়েছিলুম। মনে হচ্ছিল সখ করে বেড়াতে বেরিয়েছি, যে অবস্থায় পড়ে বেড়াতে বেরিয়েছি, তার কোন অস্তিত্ব ছিল বলেই মনে হয়নি। সাময়িক আত্মভোলা হয়ে আমি খুবই আনন্দ পাচ্ছিলুম। যখনই আবার ভ্রমণের উদ্দেশ্য মনে পড়ত তখনই মনকে বলতুম—'এ নিয়ে আর ভাবনা করো না, কি করতে হবে এর পরে দেখা যাবে।' ষ্টেশনের অর্দ্ধেকটা পথ গিয়েছি তখন হঠাৎ আমার গতিরোধ হল। গাড়ী গেল ভেঙে। গাড়ী না সারিয়ে যাবার উপায় ছিল না। এতে আমাকে পথে এত দেরী করতে হল যে, এক্সপ্রেস গাড়ী আর ধরতে পারলুম না, কাজেই কয়েক ঘণ্টা দেরী করে যাত্রী গাড়ীতে যেতে হল। তার ফলে মস্কোতে গিয়ে পৌছুলুম রাত দুপুরে, অথচ সেখানে যেতে পারতুম বিকেল বেলা ঠিক পাঁচটায়। বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলুম রাত্তির প্রায় একটায়। গাড়ী মেরামত করানো, বিল শোধ করা, একটা হোটেলে চা খেয়ে পয়সা দেওয়া—এই রকম করে এ-কাজে ও-কাজে এত ব্যস্ত ও অন্যমনস্ক ছিলুম যে আমার মাথায় আর কোন ভাবনাই ঢুকতে পারেনি। সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময়ে প্রস্তুত হয়ে আবার যাত্রা করলুম। এবারে আমার মনটা আরও খুসী হল। আকাশে সবে চাঁদ উঠেচে, সামান্য কুয়াশা ভেদ করে তার আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েচে, সামনে চওড়া সুন্দর রাস্তা, গাড়ীওলাও খুব রসিক, কাজেই বেশ স্ফূর্ত্তিতেই চলতে লাগলুম। নিজের কথা ত ভুলেই গিয়েছিলুম। সমস্ত আনন্দের কাছে চিরবিদায় নেওয়ার জন্যই বোধ হয় এত স্ফূর্ত্তি হয়েছিল? জানি না। তবে এইটুকু জানি যখন ষ্টেশনে এসে উপস্থিত হলুম তখনই আমার মনের শান্ত গম্ভীর প্রফুল্লতা দূর হল, দুর্ভাবনা দমন করবার সমস্ত শক্তি শেষ হয়ে গেল।

যেমনি ট্রেণে চাপলুম আমার মনের সমস্ত অবস্থা একেবারে বদলে গেল। ট্রেণের এই আট ঘণ্টা ভ্রমণে যে অভিজ্ঞতা আমার হল তা মৃত্যু পর্য্যন্ত মনে থাকবে। ট্রেণে যেতে যেতে আমার গন্তব্য স্থানের কাছাকাছি হচ্ছি, কিংবা ট্রেণে ভ্রমণ করলেই মন চঞ্চল, চিন্তাব্যাকুল হয়ে ওঠে, জানিনে। এইটুকু বেশ জানি যে যেমনি ট্রেণে উঠলুম, মন চেপে রাখবার ক্ষমতা একেবারে হারিয়ে ফেললুম। চিন্তার ধারা আমার মাথায় ঢুকে আমাকে অস্থির করে তুললে। চিন্তার মূল কারণ সেই একই জিনিষ। এই অবিরাম চিন্তা ও কল্পনা আমার সন্দেহ, ঈর্ষা ও বিদ্বেষ ক্রমাগত বাড়াতেই লাগল। আমি বাড়ী থেকে চলে এসেচি এই সুযোগে আমার বাড়ীতে সেই লোকটার যাতায়াত, আমার স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতা আর ব্যভিচার—এই সব ভাব্না আমাকে ভীষণ ভাবে চেপে ধরল। এই কল্পনা যেন বাস্তব হয়ে আমার কাছে ফুটে উঠ্ল, রাগে, ঘৃণায়, অপমানে আমার পায়ের আঙ্গুল থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত দপ্ করে জ্বলে উঠ্ল, আমি আর নিজেকে সাম্লাতে পাচ্ছিলুম না, আমি যেন তখন মাতাল। এই চিন্তার বোঝা ঝেড়ে ফেলাত দূরের কথা, যতই বেশী ভাবতে লাগলুম ততই বেশী এর অস্তিত্বে বিশ্বাস দৃঢ় হল, যে জীবন্ত চিত্র আমার মনের সামনে ফুটে উঠ্ল তা-ই সম্পূর্ণ সত্য বলে মনে হল। আমার ভিতরে তখন একটা প্রচণ্ড দানবের তাণ্ডব চলেচে, সয়তান আমাকে নাচাচ্ছে আর আমার মগজটার ভেতরে কত রকমের বীভৎস কল্পনা জোর করে ঢুকিয়ে দিচ্ছে।

"ট্রুখার ভাইয়ের সঙ্গে অনেক বছর পূর্ব্বে একটা কথা হয়েছিল, আজ তা মনে পড়্ল। সে যে কথাটা বলেছিল তার ভাই আর আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে সেই কথাইত ঠিক লেগে গেচে! কে যেন একটা প্রচণ্ড ঘা মেরে আমার হৃৎপিণ্ডটা চুরমার করে দিলে। বহুদিন পূর্ব্বের

কথা হলেও সে কথা স্পষ্ট মনে পড়্‌ল। টুখার ভাইয়ের চরিত্রে আমার সন্দেহ হয়েছিল, তাই তাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম যে, খুব ঘৃণিত স্থানে সে যায় কি না। সে জবাব দিয়েছিল যে ভদ্র সমাজের মহিলাদের সঙ্গেই খুব সহজে ভাব করা চলে। এই লোকটারই ভাই আমার স্ত্রীর কাছে খুব দহরম মহরম কচ্ছে না, এ অসম্ভব; এ হতেই পারে না। এ রকম ভাববার ভিত্তিটাই বা কি? আমার স্ত্রীত আমায় বলেছিল এ রকম সন্দেহ করাটাও তার পক্ষে অপমান-জনক। তবে কি সে মিছে কথা বলচে? হ্যাঁ. মিছে কথাই বলেচে, নিশ্চয়ই মিছে কথা। সেত সব সময়েই মিছে কথা বলে।

"আমি যে গাড়ীতে ছিলাম সে গাড়ীতে আমি ছাড়া মাত্র আর দুই জন যাত্রী ছিলেন! এক বৃদ্ধ আর তাঁর স্ত্রী। তাঁরা দুজনে চুপ করেই ছিলেন। মাঝখানের একটা ষ্টেশনে তাঁরা নেমে গেলেন. আমি গাড়ীতে একা রইলুম! আমার অবস্থা তখন খাঁচায় আটকানো জানোয়ারের মত। একবার হঠাৎ লাফিয়ে উঠে ছুটে জান্‌লার কাছে গেলুম, তার পর গাড়ীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে টলতে লাগলুম, তারপর খানিকটা সামনের দিকে চলতে লাগলুম যেন গাড়ীটাকে পেছনে ফেলে যেতে চেষ্টা কচ্ছি! কিন্তু আমাদের এই ট্রেণটি যেমনি চল্‌চে সেই ট্রেণটাও ঠিক তেমনি হেলে দুলে চারদিক কাঁপিয়ে দিয়ে সমান বেগেই চল্‌তে লাগল।"

পজ্‌নিশেফ হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিলেন। একবার এদিকে একবার ওদিকে কয়েক মিনিট ধরিয়া পায়চারি করিলেন, তারপর আবার বসিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"এই ট্রেণকে আমি কি ভয়ই করি। ট্রেণে চাপলেই ভয়ে শিউরে উঠি, সত্যিই শিউরে উঠি। আমার মনে ভয় হতেই ভাবলুম আর

একটা বিষয় নিয়ে ভাবি, যে ভাবনা মাথায় ঢুকে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে মগজটা চিরে কোন রকমে সেটাকে টেনে বের করা যায় কি না। ঐ যে রাস্তার ধারে হোটেলে বসে চা খেয়েছিলুম সেই হোটেলওয়ালার কথা ভাবতে আরম্ভ করলাম। মনের চোখে দেখলুম দরোয়ান তার লম্বা দাড়ী নিয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে, সঙ্গে তার নাতিটী। নাতিটি ঠিক আমার বড় খোকার বয়সী। আমার বড় খোকা! সে দেখবে যে একটা বেহালা বাজিয়ে তার মাকে ধরে চুমো খাচ্ছে! বালকের সরল মন কি রকম হবে, দেবদূতের মত নির্ম্মল সুন্দর এই কচি ছেলের ভবিষ্যৎটাই বা কি? তার মা কি সে জন্য ভাবে? সে যে প্রেমে পড়েচে। এমনি করে আবার সেই কথাই আরম্ভ হল! মনকে দমন করে এবার একটা হাসপাতালের কথা ভাবতে লাগলুম। এক রোগী তার ডাক্তারের দোষ দিচ্ছিল, সেই ডাক্তারের গোঁফটাও টুখার গোঁফটার মত। মস্কো ছেড়ে চলে যাবে বলে কি হীন, কি নির্লজ্জ ভাবেই সে আমার সঙ্গে প্রতারণা করেচে। আমার আবার সেই ভাবনা ঢুকল, ভীষণ মর্ম্মযাতনা উপস্থিত হল। এমন কোন বিষয় পেলুম না যা ভাবতে গেলে ঐ এক ভাবনা এসেই আমায় চেপে ধরে না। আমার কি যন্ত্রণাই হল! অনিশ্চয়তা, সন্দেহ, মনের অস্থিরতাই আমাকে সব চেয়ে বেশী কষ্ট দিচ্ছিল। স্ত্রীকে ভালবাসব কি ঘৃণা করব? কি করব? কি কষ্টই হচ্ছিল! একবার ভাবলুম রেলের লাইনের ওপর শুয়ে পড়ি, আর আমার বুকের ওপর দিয়েই ট্রেণটা চলে যাক। সমস্ত যন্ত্রণা, সব জ্বালা জুড়িয়ে যাক। আত্মহত্যা করার ইচ্ছায় আমার আনন্দই হল। আনন্দ হবে না কেন? যন্ত্রণার অবসান হবে ত! কিন্তু আত্মহত্যা করতে পারলুম না শুধু এই জন্য যে আমার ওপরেই আমার দয়া হচ্ছিল। নিজের

ওপরে নিজেরই দয়া হওয়ায় স্ত্রীর ওপরে আমার ঘৃণা আবার জেগে উঠল। সেই লোকটার ওপরে যে ঘৃণা ছিল তার একটু বিশেষত্ব ছিল যে ঘৃণার সঙ্গে আমার অপমান ও দুঃখ, তার জয় ও আনন্দমিশ্রিত ছিল, কিন্তু স্ত্রীর উপরে ঘৃণা ছিল একেবারে মারাত্মক রকমের। ভাবলুম স্ত্রীকে ত্যাগ করেও আমি চলে যেতে পারিনে, তারও আমার মত যন্ত্রণা হওয়া উচিত, আমি যে জ্বালায় জ্বলছি এটাও অন্ততঃ তার বোধ করা দরকার।

আনমনা হওয়ার জন্য আমি সমস্ত ষ্টেশনেই নেমেছিলুম। একটা ষ্টেশনে দেখলুম লোকে একটা দোকান থেকে মদ কিনে খাচ্ছে, আমিও তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে দোকানে ঢুকে একটু মদ খেলুম। দোকানের টেবিলের কাছে আমার পাশেই একজন ইহুদী দাঁড়িয়ে ছিল, সে আমার সঙ্গে কথা জুড়ে দিলে। গাড়ীতে আর আমার একলা থাকতে ইচ্ছে হচ্ছিল না বলে তার সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠে পড়লুম। কামরাটা ছিল অত্যন্ত নোংরা, তামাকের ধোঁয়ায় ভরা, আর সমস্ত মেঝেটায় ছিল সূর্য্যমুখী ফুলের বীজের খোসা ছড়ান। আমি তারই পাশে বেঞ্চিতে বসলুম। সে আমাকে অনেক গল্প বলছিল, তা আমি মোটেই বুঝতে পারিনি কিংবা শুনিনি। সে লক্ষ্য করলে যে আমি অন্যমনস্ক, অমনি সে আমায় তার কথা মন দিয়ে শুনতে বললে। আমি উঠে নিজের কামরায় চলে এলুম। স্থির করলুম—বাস্তবিকই আমার উদ্বেগের কারণ আছে কিনা ভাল করে ভেবে দেখতে হবে, দুটো দিকই তুলনা করে দেখব। কিন্তু তখনই সেই পুরোণো চিন্তার ধারা আবার হু হু করে আমার মাথায় ঢুকল।

ভাবলুম—এই একই ভাবে ত নিজেকে আমি যন্ত্রণা দিয়েই আসচি। হতেও পারে ত আমার সন্দেহের কোনই ভিত্তি নেই। বাড়ীতে

গিয়েই দেখব আমার স্ত্রী খুব ঘুমুচ্ছে। তার কথায়, তার চাউনীতেই আমি বুঝতে পারব যে সে কোন অন্যায়ই করেনি, এই সন্দেহ, এই ভীষণ উদ্বেগের মূলে রয়েচে আমার মস্তিষ্কেরই একটা উদ্ভট ও উৎকট কল্পনা। সেটা কি আনন্দের বিষয়ই হবে। কিন্তু তখনই আমার ভেতর থেকে শোনতে পেলুম—'না, না, এ রকম আনন্দ তোমার অনেকবারই হয়েচে, এবার হবে না, হবে না।' ব্যস আবার সেই আগুন দপ করে উঠল, আমার ভেতর ও বাইরেটা দাউ দাউ করে জ্বলল। হাসপাতালের রোগীর যন্ত্রণা এ নয়, এ যে অন্তরে এক প্রচণ্ড তাণ্ডব, কোন বিকট দৈত্য যেন তার কঠিন নির্ম্মম হস্তে আমার হৃৎপিণ্ডটা টেনে ছিড়ে ফেলতে চাইচে। একদিকে যেমন আমার ধারণা ছিল যে স্ত্রীর ওপরে আমার এক অপরিবর্ত্তনীয় এবং অপরিহার্য্য অধিকার আছে, কারণ সে শুধু আমারই, অন্য দিকেও আবার আমার ধারণা হল যে আর তাকে পাওয়ার উপায় আমার নেই, সে আর আমার নয়, যা খুসী সে তাই করতে পারে; যদি স্ত্রী আমার প্রতারণা না করে থাকে আর যদি এখন করতে চায়, তা হলে সেত আরও খারাপ। তার চেয়ে সে যদি আমার চোখে ধূলো দিয়েই থাকে সেও ঢের ভাল; তা হলে কি যে আমায় করতে হবে তা স্থির করে ফেলে নিশ্চিন্ত হব, এই সন্দেহ, এই সংশয় আর এই ভয় সব দূর হবে। আমি কি চাই, কি হলে খুসী হই, কি কচ্ছি, কেন কচ্ছি—কিছুই স্থির করতে পারলুম না। আমি তখন পাগল।"

কয়েক মিনিট বিশ্রাম করিয়া একটু স্থির হইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,—

"মস্কোর আগেকার ষ্টেশনে এসেচি। গার্ড আমাদের টিকেট নিতে লাগলেন। সব জিনিষ-পত্র গুছিয়ে নিয়ে একবার প্লাটফরমে নাম্‌লুম। সামনেই মস্কো, ব্যস্, তার পরেই যাব। বাড়ীতে ঢোকবার সময় হয়ে এসেচে জেনেই আমার উৎকণ্ঠা ভয়ানক বেড়ে গেল। তখন একেবারে কনকনে ঠাণ্ডা, আমার দাঁতে দাঁত লাগ্‌ছিল। দেখ্‌তে দেখ্‌তেই মস্কোতে এসে পড়লুম। ষ্টেশনে নেমেই একটা গাড়ী ডেকে উঠলুম, চল্লুম বাড়ীর দিকে। মাঝে মাঝে দু একজন লোক, কোন কোন বাড়ীর সামনে দু একটা দরোয়ান—আমার চোখে পড়ল; গাড়ীর লম্বা লম্বা ছায়ার দিকে আর আমার সামনে ও পেছনে কয়েকবার তাকালুম। এতক্ষণ কিছুই ভাবিনি। প্রায় আধ মাইল গেছি তখন আমার পায়ে ভয়ানক ঠাণ্ডা লাগল। তখন মনে হল আমার পশমী মোজা জোড়া ব্যাগে রেখেচি। ব্যাগটাই বা কোথায়? গাড়ীতে নিয়ে এসেচি ত? ট্রাঙ্কটা? আমার আর জিনিষ গুলো? সবই ট্রেণে রয়েচে, সবই ভুলে ফেলে এসেচি। জিনিষের ভাড়া দেয়ার রসিদটা আমার সঙ্গেই ছিল। ভাবলুম—ফেলে এসেচি ত এসেচি আবার একটা ফিরে যাওয়া পোষায় না। গাড়ী চল্‌তেই লাগল। ষ্টেশন থেকে বাড়ী যাওয়ার পথে কি ভেবেচি, আমার মনের অবস্থা কি ছিল তা আর মনে কর্‌তে পারি নে।

"কেবল এইটুকু মনে আছে যে, আমি বুঝতে পেরেছিলুম আমার

জীবনে একটা বিষম কাণ্ড ঘট্‌বার উপক্রম হয়েচে, একটা বিপদ একেবারে আসন্ন। পরে সত্যিই যা ঘটেছিল তার আগেকার এই সময়টায় সেই ভীষণ চিত্র আমার মনে ফুটে উঠেছিল।

"বাড়ীর দরজায় গাড়ী এল। রাত্তির তখন প্রায় একটা। দেখলুম দরজার কাছে রাস্তায় কয়েকজন গাড়োয়ান ভাড়ার অপেক্ষায় রয়েচে। আমার ঘর আর বৈঠকখানার জান্‌লা খোলা আছে, ভেতরে খুব জোর আলো জ্বলচে। এত রাত্তিতে আমার ঘরে কেন আলো জ্বল্‌চে তা আর বোঝবার চেষ্টা না করে, একটা কিছু ভীষণ কাণ্ডের আশঙ্কায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে সিড়ির কাছে গিয়ে ঘণ্টা বাজালুম। আমার চাকর জর্জ্জ এসে দরজা খুলে দিলে। জর্জ্জ যেমন ছিল খুব সৎ এবং সরল ঠিক তেমনি ছিল বোকা। ঢুকে সামনের ঘরটায় দেখলুম র‍্যাকের সঙ্গে কোট আর টুপী ঝুলচে। এ টুপী আর কোট আমার নয়। তখনই আমার তাক লেগে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু শুধু এই জন্যই চমকাই নি যে, আমি এইটিই আশা করেছিলুম। যা ভেবেচি এ-ত তাই। জর্জ্জকে জিজ্ঞেস্ করলুম, 'কেউ কি এসেচে?' সে বল্‌লে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, ট্রুখা।' 'আর কেউ এসেচে?' 'আজ্ঞে না।' যে স্বরে সে আমার কথার উত্তর দিচ্ছিল সে স্বরটি আমার এখনও মনে আছে। যদি ঘরে আর কোন লোক থাকবার আশঙ্কা আমি করে থাকি, সে যেন তার জবাবের মধ্য দিয়ে আমার সে আশঙ্কা দূর করে দিয়ে আমাকে খুসী করতে চেয়েছিল। আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'খোকা খুকী?' আজ্ঞে ভগবানের ইচ্ছায় তারা ভাল আছে। তারা ত অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে আছে।' আমার যেন দম আটকে আস্‌চিল, দাঁতে দাঁতে লেগে ঠক্ ঠক্ কচ্ছিল। কেবল কেবল ভেবেচি, দুর্ভাগ্যের— বিপদের কল্পনাই করেচি, এবারে সেই ভীষণ কঠোর বিপদের সামনে

এসে দাঁড়িয়েছি ; যা শুধু আমার মগজের ভেতরেই ছিল তা আজ বাস্তবে পরিণত হয়েচে, আমার কল্পনা যে আজ আমার সামনে জীবন্ত হয়ে উঠেচে।

"আমার বুক ফেটে কান্না বেরুবার উপক্রম হচ্ছিল। কিন্তু সয়তান যেন আমার কাণে কাণে বল্‌লে 'এ কান্নায় দুর্ব্বলতা আসে, অবসাদ আসে, সময় নষ্ট করো না, তারা টের পেয়ে সাবধান হবে, আর সুযোগ হারিয়ে ঘোর সন্দেহ নিয়ে সারাটা জীবন অসহ্য করে তুলবে। আমার সমস্ত আড়ষ্ট ভাব, সমস্ত কাতরতা হঠাৎ দূর হয়ে গেল, আমি উত্তেজিত হয়ে গেলুম। আপনি হয়ত বিশ্বাসই করবেন না যে, ব্যাভিচারিনী বঞ্চনাকারিনী স্ত্রীকে শাস্তি দিতে পারব, তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব, আর আমার সমস্ত যন্ত্রণার অবসান হবে বলে আমার একটা আনন্দের ভাবই জেগে উঠল। তার প্রতি ঘৃণা আমাকে একথা অতি ধূর্ত্ত, অতি নিষ্ঠুর হিংস্র বন্য জন্তু করে ফেল্‌ল। জর্জ্জ আমার বৈঠকখানায় ঢুকতে যাচ্ছিল। আমি বল্‌লুম—'থাম, 'থাম যত শীগ্‌গীর পার একটা গাড়ী নিয়ে ষ্টেশনে গিয়ে আমার জিনিষ পত্র সব নিয়ে এস। এই নাও রসিদ। দেরী করো না।' সে জামা পরতে গেল বারান্দা দিয়ে সে আবার তাদের সাবধান করে দেয় এই ভয়ে আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে তার ঘরের কাছে গেলুম সেখান থেকে অস্পষ্ট কথা আর থালা চাম্‌চে কাঁটার শব্দ শোনতে পেলুম। তারা তখন খুব ফুর্ত্তি করে খানা পিনা কচ্ছিল। চাকরকে ডাকবার জন্য যে ঘণ্টা বাজিয়েছিলুম তা তারা শোন্‌তেই পায় নি। মনে মনে বললুম—ভগবান আর যেন খানিকক্ষণ ঘর ছেড়ে না যায়। জর্জ্জ জামা কাপড় গায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি দরজা বন্ধ করে দিলুম। আমার তখন যে ভাব হয়েছিল তা কেবল আমিই জানি। খুব তাড়াতাড়ি যা হোক্ কিছু করতে ইচ্ছা

হল। কিন্তু কি করব? কি করে করব? আরত কোন সন্দেহই নেই। এই ঘোর অপরাধের জন্য স্ত্রীকে শাস্তি দিতেই হবে, তার সঙ্গে চিরকালের জন্য সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ কর্‌তেই হবে। এতদিন ধরে কেবল সন্দেহ, কেবল কষ্ট, কেবল ভাবনা বুঝি বা আমারই ভুল। সে ভাবনাত দূর হয়েচে। আমার অজ্ঞাতসারেই ঐ লোকটার সঙ্গে একলা এ রাত্তিরে! ততই আত্ম-বিস্মৃতি, কিংবা এই দুঃসাহস ভেবে চিন্তেই করেচে, নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ কর্‌বার জন্যে খোলা খুলিই এই কাণ্ডটি কচ্ছে। যাই হোক বিন্দু মাত্র সন্দেহ ও আর নেই, চোখে দেখে আমার সমস্ত ভাবনাই দূর হল, এখন এই এক ভাবনা ওরা না না পলাতে পারে, কোন নতুন কৌশল করে আমাকে আর ঠকাবার সুযোগ না পায়, আমার এই চাক্ষুষ প্রমাণটাই ব্যর্থ করে না দেয়।

"খুব তাড়াতাড়ি এসে তাদের ধরবার জন্যে আমি আমার ঘরের দিকে গেলুম। সেই ঘরেই তারা ছিল। বৈঠকখানার ভেতর দিয়ে গেলুম না, গেলুম বারান্দা দিয়ে ছেলেদের ঘরের ভেতর দিয়ে পা টিপে টিপে। ছেলেরা তখন খুব ঘুমুচ্ছিল। তাদের পাশের ঘরেই তাদের ধাই মা ঘুমুচ্ছিলেন, তিনি এমনি নড়ে চড়ে উঠলেন যেন তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেচে। ভাবলুম যে জঘন্য ব্যাপার চল্‌চে এ যদি তিনি জেগে টের পান তা হলে কি ভাববেন? হায়রে আমার বরাৎ! আমার নিজের ওপর নিজেরই এমন দয়া হল যে, চোখের জল আর চেপে রাখ্‌তে পারলুম না। ছেলেরা যাতে না জাগে এই জন্য আবার পা টিপে টিপে বারান্দা দিয়ে আমার পড়বার ঘরে ফিরে গেলুম, সে ঘরে ঢুকেই একটা সোফার ওপরে ধপাস্ করে বসে পড়লুম, কান্না আর কোন বাধা মান্‌লে না।

"আমি নিজে এক পদস্থ লোক, আমার বাপ মা সমাজের সকলের

কাছেই সম্মান ও ভালবাসাই পেয়েচেন, আজ সেই বংশের মর্য্যাদা টুকুও রক্ষা করা গেল না! আমি তার স্বামী হয়ে কখনোত তার কাছে অবিশ্বাসী হই নি, তাকে প্রতারিত করি নি। স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে পারিবারিক সুখের কত কল্পনাই না করেচি! আজ বেঁচে আছি শুধু এই ব্যাপারটি দেখবার জন্য! পাঁচ পাঁচটা ছেলে পুলের মা একটা ভব ঘুরে বেহালা বাজিয়ের আলিঙ্গনে আবদ্ধ! ছি ছি! না, সে মানুষ নয়, সে—আর এ সব চল্‌চে কোথায়? ছেলেদের ঘরের পাশের ঘরটিতেই। এই ছেলে মেয়েদেরই না খুব ভালবাসে বলে সে ভাণ করে? এই কি মায়ের ভালবাসা? মা হয়ে সন্তানের মঙ্গল দেখে না? এ কেমন মা? তার পর আমাকে ঐ রকম চিঠি দিয়া। সম্ভবতঃ এ যোগাযোগ অনেকদিন ধরেই চল্‌চে! যদি আজকে রাত্তিরে না এসে কালকে দিনে আস্‌তুম তাহলে তাকে দেখ্‌তে পেতুম ভাল করে—আচড়ানো চুলে সিঁথি কাটা আর সব চাইতে সুন্দর পোষাকটি পরা। হেল্‌তে দুল্‌তে সে আমার কাছে আস্‌ত, আর আমার অন্তরের ঘৃণা, বিদ্বেষ, সন্দেহ আমার সমস্তটা হৃদয় দলে পিষে দিত। ছেলেদের শিক্ষয়িত্রী একজন ভদ্র মহিলা, তিনিই বা কি মনে কর্‌বেন? আর চাকরটা? আহা আমাদের মেয়েটা? মেয়েটাত একটু বড় হয়েচে, সেত কিছু কিছু বুঝ্‌তে শিখেচে! ছি ছি! কি নির্লজ্জতা, কি ভণ্ডামি! এই কথাগুলো ভেবে ভেবে আমার মনটা অবসন্ন হয়ে পড়্‌ল, উঠে দাঁড়াবার শক্তিও যেন লোপ পেয়ে গেল।

"উঠতে চেষ্টা করলুম পারলুম না। বুকের ভেতর এমন জোরে টিবিস্ টিবিস্ কচ্ছিল যে দাঁড়াতে পাচ্ছিলুম না। আশঙ্কা হল অজ্ঞান হয়ে ধপাস্ করে পড়ে মারা যাব। স্ত্রীই আমার মৃত্যুর কারণ হবে। সে তা-ই চায়। আমার মৃত্যু তার কাছে অপ্রত্যাশিত লাভ, তাকে

সে আনন্দ আমি দিতে পারি না। এই আমি আমার ঘরে বসে আছি, ওদিকে তারা হাস্‌চে, খাচ্ছে, গল্প কচ্ছে আর মজা লুটচে, তখনই কেন ওদের টুঁটি টিপে ধরি নি? এই যে এক সপ্তাহ আগেই স্ত্রীকে এই পড়বার ঘর থেকে জোর করেই বের করে দিয়েছিলুম, টেবিলের ওপরের জিনিষগুলো তার সাম্‌নে ছুঁড়ে ভেঙে ফেলেছিলুম, তখনই কেন তাকে খুন্ করি নি? সেই সময়কার অবস্থা স্পষ্ট আমার মনে জেগে উঠ্‌ল, তাকে মারবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠ্‌ল। একটা কিছু করবার জন্য আমার ভয়ানক উত্তেজনা হল, এখনই একটা কিছু করা চাই,—এই প্রবল ইচ্ছা ভিন্ন আমার মনে আর কিছুই রইল না। সমস্ত দেহটায় তখন যেন আগুন ধ'রে গেচে, আমি তখন হিংস্র ক্রুদ্ধ বিকট জানোয়ার। আসন্ন বিপদের সময় মানুষ তাড়াতাড়ি করে হঠাৎ কিছু করে না, অথচ নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাম্‌নে রেখে এক মুহূর্ত্তও নষ্ট করে না, ঠিক সেই রকমের অবস্থায়ই আমি তখন পড়ে গেলুম।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই পজ্‌নিশেফ্‌ থামিলেন, তাঁর স্বর কাঁপিয়া যাইতেছিল। ব্যাগ থেকে একটি চুরুট বাহির করিয়া ধরাইলেন এবং সেটিকে নিঃশেষ করিয়া যেন একটু স্থির হইলেন। তারপর তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন।

"প্রথমেই পা থেকে জুতোটা খুলে ফেল্‌লুম, ঘরের এক দিককার দেয়ালে কয়েকটা ছোড়া ও বন্দুক ঝুলছিল, খুব ধারাল একটা বাঁকা ছোরা নামালুম। কিনে অবধি এই ছোরাখানা আর ব্যবহার করি নি। খাপটা খুল্‌তেই আমার হাত থেকে সোফার পেছনে পড়ে গেল। খাপ আর না খুঁজে গা থেকে ওপরের বড় কোটটা খুলে ফেল্‌লুম। তারপর আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে তারা যে ঘরে ছিল সেই দিকে চল্‌লুম। চুপি চুপি গিয়ে হঠাৎ দরজাটা খুলে ফেল্‌লুম।

"তাদের চাউনিটি আমি এখনও স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি। এই চাউনিতে আমার খুবই আনন্দ হচ্ছিল, কারণ এ চাউনি ভয়ের চাউনি, শিকারীর দিকে অসহায় মৃগের চাউনিরই মত; তাহাদের এই ভয়ই আমি চেয়েছিলুম। মর্‌বার দিনও ভুল্‌ব না যে, নৈরাশ্য এবং আতঙ্ক তাহাদের মুখখানা কি রকম ফ্যাকাসে করে দিয়েছিল। ট্রুখা আমাকে দেখেই চম্‌কে লাফিয়ে উঠে কুলুঙ্গীতে ঠেস্‌ দিয়ে দাঁড়াল, তার সমস্ত দেহটাই তখন অতি ঘৃণিত ভয়-মাখানো। আমার স্ত্রীর মুখখানাও তা-ই, তবে ভয় ছাড়াও তাতে আরও একটা কিছু ছিল। যদি ভয় ছাড়া আর কিছু তখন তার ভিতর না থাকৃত তা হলেও একটু পরেই যে ঘটনা ঘট্‌ল তা হয়ত ঘট্‌ত না। শুধু এক মুহূর্ত্তের জন্য সে, যে সুখ, যে আনন্দ ভোগ কচ্ছিল আমি হঠাৎ এসে পড়ায় তাতে ব্যাঘাত হয়েচে বলে নৈরাশ্য ও বিরক্তির ভাবটি তার মুখে ফুটে উঠেছিল বলেই মনে হয়। তার যেন শুধু এই একটি চিন্তাই ছিল যে, সে একলা থেকে তার ইচ্ছা পূরণ করবে, আর এতে যেন কেউ তাকে বাধা না দেয়। এ ভাব তার মুখে মুহূর্ত্ত মাত্র ছিল। কারণ ট্রুখা তার দিকে তাকালে আর যেন শুধু চোখ দিয়েই তাকে জিজ্ঞেস্‌ কর্‌লে, 'মিছে কথা বলে এখনও রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় আছে কি? যদি থাকে তা আরম্ভ করবার সময় এই-ই, আর যদি না থাকে ভয়ানক একটা কিছু ঘট্‌বে। প্রণয়ীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই প্রণয়ীর জন্যই উৎকণ্ঠায় আমার স্ত্রীর নৈরাশ্য এবং বিরক্তির ভাব দূর হল। আমি ছোরাটা আমার পেছন দিকে ধরে দরজার চৌকাটে মুহূর্ত্তখানেক দাঁড়িয়েছিলুম। তখনই ট্রুখা একটু হেসে যেন নিতান্ত বিদ্রূপের ভাবে কৃত্রিম শান্ত স্বরে বল্‌লে,—"আমরা আজকে বাজ্‌না নিয়েই পড়েছিলাম।"

"তার এই কথা বল্‌তে না বল্‌তেই আমার স্ত্রীও কথা কওয়ার সুযোগ পেয়ে ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই বল্‌লে, 'এ একেবারে হঠাৎ এসে পড়া !'

"তারা যা বল্‌তে যাচ্ছিল তা আর শেষ করতে পার্‌লে না। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে যে ভীষণ উন্মত্ততা আমায় ব্যাকুল করে দিয়েছিল, যে প্রচণ্ড উত্তেজনায় আমি ক্ষ্যাপা কুকুরের মত ছট্‌ফট্‌ কচ্ছিলুম সেই উৎকট উন্মত্ততা আর উত্তেজনা আবার জেগে উঠ্‌ল ; একেবারে সব শেষ করে দেওয়ার জন্য আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠ্‌লুম, ক্ষিপ্ততার নগ্নমূর্ত্তির কাছে দেহ মন নুইয়ে দিলুম।

"যাই হোক, তারা তাদের কথা শেষ কর্‌তে পার্‌লে না। যা করলুম তাতে ভয়েই তাদের সমস্ত কথা চ'খের নিমেষে বন্ধ হয়ে গেল। পাছে লোকটা আমায় বাধা দেয় এই ভয়ে ছোরাটা লুকিয়ে নিয়েই আমি বিদ্যুদ্বেগে স্ত্রীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়্‌লুম ! প্রথমেই ঠিক করেছিলুম যে, ছোরাটা একেবারে তার বুকে বসিয়ে দেব। যেমনি স্ত্রীর ওপর গিয়ে পড়লুম অমনি লোকটা আমার হাত দুটো পেছন থেকে ধ'রে ভয়ানক জোরে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল 'ভেবে দেখ কি কচ্ছ ! কে আছ রক্ষা কর ! রক্ষা কর !'

"হাত ছাড়িয়ে নিয়ে একটি কথাও না কয়ে লোকটাকেই আক্রমণ করলুম। আমার চোখে চোখ পডতেই সে একেবারে কাগজের মত সাদা হয়ে গেল, তার ঠোঁটের লালিমা মুহূর্ত্তের মধ্যেই লোপ পেয়ে গেল, চোখ দুটা তার জ্বল্‌ জ্বল্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, যার সঙ্গে প্রণয় করতে এসেছে তাকে একলা বিপদে ফেলে সে ঝাঁ করে পিয়ানোর নীচে ঢুকে পড়ল এবং সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

"শিকার পালিয়ে গেল দেখে আমিও ছুটলুম। ছুটতে গিয়ে টের

পেলুম আমার বাঁ হাতটায় অত্যন্ত ভারি একটা বোঝা ঝুলছে। এ আমার স্ত্রী, আমাকে টেনে রাখবার জন্য চেষ্টা কচ্ছে প্রণয়ীকে রক্ষা করবার জন্য। হাত ছাড়াতে যতই চেষ্টা করলুম সে ততই আমায় চেপে ধর্‌লে, আমার গতিরোধ কর্‌লে। এই অপ্রত্যাশিত বাধা আর তার দৈহিক সংস্পর্শ আমাকে আরও ক্ষিপ্ত, আরও উত্তেজিত করে দিলে। আমার সমস্ত শরীরে যেন ভীষণ আগুন লেগে গেছে, আমার ভেতরটা তখন একেবারে যেন টগ্‌বগ্ করে ফুট্‌চে।

আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ঝাঁকানি মেরে তাকে পেছন দিকে এমন ধাক্কা মারলুম যে, তার মুখে আমার কনুইয়ের একটা ভীষণ ঘা লাগ্‌ল। চীৎকার করে উঠে সে আমার হাত ছেড়ে দিলে।

আমি লোকটার পেছন পেছন ছুটতে যাচ্ছিলুম তখন হঠাৎ আমার মনে এলো—পায়ে আমার জুতো নেই আছে শুধু মোজা, এই ভাবে স্ত্রীর গুপ্ত প্রণয়ীর পেছন পেছন ছুটে লোকের কাছে নেহাৎ খেলো হতে হবে, লোকে আমায় পাগল বলে হাততালি দেবে। সকলে হাসবে আর হাত তালি দেবে এটা আমি মোটেই ইচ্ছা করিনি। ক্রোধের উন্মত্ততা সত্ত্বেও আমার সে ধারণা ছিল। এই হুসটুকু ছিল বলেই সময়ে সময়ে ঠিক পথে চলতে পারতুম।

এবার স্ত্রীর দিকে ফিরলুম। তার চোখে আঘাত লেগেছিল, দু'হাতে আহত স্থানটি চেপে ধরে সে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। তার মুখে তখন ভীষণ ভয় আর আমার প্রতি ভীষণ ঘৃণা ফুটে উঠেচে। ফাঁদে আটকান ইঁদুরকে আলোর কাছে নিয়ে এলে তার যে অবস্থা হয় আমার স্ত্রীরও তখন ঠিক সেই অবস্থা। অন্ততঃ আমি তার চেহারায় ঘৃণা ও ভয় পরিস্ফুট দেখলুম। যে ভয়ানক কাণ্ড আমি করলুম তা হয়ত কর্‌তুম না, ঘটনা হয়ত অন্যরকম ঘটত যদি সে তখন কথা না কইত।

আমার যে হাতে ছোরাটা ছিল সেই হাতটা টেনে ধরে সে অমনি বলে উঠ্‌ল,—'কি কচ্ছ ভেবে দেখ। ওর সঙ্গে আমার কিছুই হয়নি, কিছুই নয়। আমি শপথ করে বল্‌চি কিছুই নয়।'

তখনও হয়ত আমার দ্বিধা থাক্‌ত, কিন্তু ঐ শেষ কথাটা 'কিছুই নয়' থেকে আমি ঠিক কর্‌লুম যে ঠিক উল্টোটাই সত্যি, সবই হয়েছে। এর একটা জবাব চাই, আর আমার ক্রোধের যে বিকট উন্মত্ততা এসেছে তার অনুরূপই এ জবাব হবে। মনের অন্যান্য অবস্থারই মত এই উন্মাদনাও তার নিজেরই আইন মেনে চলে।

বাঁ হাত দিয়ে তার হাতে জোরে ধরে আমি গর্জ্জন করে উঠলুম—'মিছে কথা বলিসনে পিশাচী সয়তানী।' কিন্তু সে তার হাত ছিনিয়ে নিলে। আমি ডান হাতে ছোরাটা খুব শক্ত করে ধরে বাঁ হাত দিয়ে ধাক্কা মেরে তাকে চিৎ করে ফেল্‌লুম আর তার গলাটা চেপে ধরলুম। গলাটা কি শক্ত মনে হল! গলা থেকে হাতটা ছাড়িয়ে সে আমার দুটো হাতই ধর্‌লে, আর আমিও তখনই তাকে চেপে ধরে তার পাঁজরার ভেতরে ছোরাটা সজোরে বসিয়ে দিলুম, আর——

* * * *

লোকে বলে ক্রোধে উন্মত্ত হলে কি কচ্ছে না কচ্ছে তা আর মানুষের খেয়ালও থাকে না মনেও থাকে না। আমার মনে হয় এটা বাজে কথা কিংবা মিছে কথা। আমি তখন যা কচ্ছি তা জানতুম, এক মুহূর্ত্তের জন্যও তা ভুলিনি। যতই রাগ বেশী হচ্ছিল ততই কি কচ্ছি সেটা বেশী স্পষ্ট দেখছিলুম। আমি যা কচ্ছিলুম, তা যে আগে থেকেই জান্‌তুম এমন কথা বল্‌তে পারিনা, কিন্তু করবার মুহূর্ত্তেই কিংবা দুই এক সেকেণ্ড পূর্ব্বেই, আমার পূরো জ্ঞান ছিল যে আমি কি কচ্ছি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন আমি জানতুম যে তার পাঁজরার ভেতরে ছোরা

বসাচ্ছিলুম। এ জ্ঞানও আমার ছিল যে ছোরাটা ভিতরে ঢুক্‌বে। সেই মুহূর্ত্তেই এ জ্ঞানও আমার স্পষ্টই ছিল যে একটা অসম্ভব রকমের ভয়াবহ কাজ কচ্ছি যা আমার জীবনে আর কখনো করিনি এবং যার পরিণামও খুব ভয়ানক। এই পরিণাম-জ্ঞান আর কাজ একই সময়ে হয়েছিল। তার ভেতরের জামা ও কাপড়ে ছোরাটা যে সামান্য বাধা পেয়েছিল এবং তার দেহের সুকোমল মাংসপেশী কেটে কি করে ভিতরে ঢুকেছিল তা তখনও অনুভব করেছি আর এখনও তা স্পষ্ট মনে আছে। সে হাত দুটো দিয়ে ছোরাটা ধরেও ছিল, তার হাতও কেটে গিয়েছিল।

"যখন কারাগারে আমার অন্তরে একটা প্রকাণ্ড নৈতিক বিপ্লব আমার সমস্ত প্রকৃতিকে আমূল বদ্‌লে দিয়েছিল তখন সেই ভীষণ কাণ্ডের সময়ে যে ভাব, যে ধারণা আমার মনকে চঞ্চল করে তুলেছিল তাই নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেবল ভাব্‌তুম। আমার মনে আছে সেই ভীষণ ঘটনার এক সেকেণ্ড পূর্ব্বেও আমার জ্ঞান ছিল যে, নিতান্ত অসহায়া একজন রমণী—আমারই স্ত্রী পাঁচ পাঁচ জন সন্তানের জননীকে হত্যা কচ্ছি। কি অকথ্য ভয়ই যে আমার হয়েছিল তা মনে হলে এখনও শিউরে উঠি। ছোরাটা ঢুকিয়েই টেনে বের করলুম যাতে না হয়। তারপর মুহূর্ত্ত খানেক একেবারে নিশ্চল নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগলুম কি হয়, যা করেচি তার কোন প্রতিকার করা যায় কিনা।

"যন্ত্রণায় সে এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে চীৎকার করলে,—'ধাই মা, খুন করচে গো।"

"গোলমাল শুনে ধাই দরজার কাছে এসেছিল আমি তখনও নিশ্চল, তখনও বিশ্বাস করি নি যে সত্যই মেরে ফেলেচি। হঠাৎ তার জামার ভেতর থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্তের স্রোত বইল।

"বুঝ্‌তে বাকী রইল না যে যা করেচি তা আর ফেরাবার উপায় নেই। তখনই স্থির করলুম—আমিত এইটিই চেয়েছিলুম, কাজেই যা হয়েচে হোক্, প্রতিকারের আর দরকার নেই। যাক্, যেমনি রক্তের স্রোত বেরুল সেও অমনি পড়ে গেল। একটা ভীষণ চীৎকার করে ধাই তার কাছে ছুটে গেল। তখন আমি ছোরাটা হাত থেকে ফেলে দিয়ে কারুর দিকে না চেয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম।

"ধাই ঝিকে ডাক্‌লে আর চেঁচাতে লাগ্‌ল।

"আমি বারান্দা দিয়ে গিয়ে ঝিকে পাঠিয়ে দিয়ে আমার পড়বার ঘরে ঢুক্‌লুম—'এখন কি কর্‌ব?' জবাবটাও তখনই আমার মাথায় এল। দোয়ালের কাছে গিয়ে পিস্তলটা হাতে নিলুম, দেখ্‌লুম ভরাই আছে। পিস্তলটি টেবিলের ওপর রাখ্‌লুম। তারপর ছোরার খাপটা কুড়িয়ে এনে বসে পড়লুম। অনেকক্ষণ চুপ করে বসেই রইলুম, টের পেলুম অন্য ঘরগুলোয় খুব ছুটাছুটি—খুব গোলযোগ চল্‌চে। শোন্‌তে পেলুম কে যেন গাড়ী হাকিয়ে দরজা অবধি এল, তারপর আবারও একটা গাড়ীর শব্দ পাওয়া গেল। জর্জ্জ আমার জিনিষ-পত্র ষ্টেশনে থেকে নিয়ে এসে হাজির হল, যেন ঐ গুলোর অপেক্ষায়ই আমি বসে আছি! আমি বল্‌লুম, 'কি কাণ্ড হয়েচে শুনেচত। যাও, দরোয়ানকে পাঠিয়ে দিয়ে এখনই পুলিশে খবর দাও।'

"কোন কথাই না কয়ে জর্জ্জ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি সোফা থেকে উঠে একটা চুরুট ধরিয়ে টান্‌তে লাগ্‌লুম। একটা চুরুট শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই আমার ঘুম পেলে আমি আস্তে আস্তে সোফার ওপরে ঘুমিয়ে পড়লুম।

প্রায় দু ঘণ্টা ঘুমিয়েছিলুম। স্বপ্নে দেখ্‌লুম আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই দু'জনকে খুব ভালবাস্‌তুম, ঝগড়া করেচি বটে, আবার আমাদের

ভাবও হয়েচে। আমাদের সুখের পথে কিছু অন্তরায় ছিল বটে, কিন্তু অন্তরে আমাদের দুজনেরই ভালবাসা ছিল।

"দরজায় কে ঘা মারলে, স্বপ্ন ভেঙে গেল।"

"ভাব্‌লুম পুলিশ এয়েচে। আমি স্ত্রীকে খুন করেচি, হয়ত বা সে নিজেই এসে দরজায় ঘা দিচ্ছে, কিছুই ঘটে নি। আবার ঘা মার্‌লে। জবাব দিলুম না, আমি ভাব্‌তেই লাগ্‌লুম—সত্যিই কি খুন হয়েচে? হ্যাঁ, হয়েচে বৈ কি! ছুরি বসাতে তার জামায় যে বাধা পেয়েছিলুম মনে পড়্‌চে। আমার সমস্তটি শরীর যেন বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে এল, শিউরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

"হাঁ, তাকে খুন করেচি, এতে কোনও ভুল নেই। তাকে ত খুন করেচিই, এখন এ-ই আমার নিজের প্রাণ নিজের হাতে শেষ কর্‌বার সময়। এই আত্মহত্যার কথা যখন ভাব্‌ছিলুম তখনও আমি জানতুম যে আত্মহত্যা করব না। তবুও উঠে পিস্তলটা হাতে নিলুম। মনে পড়্‌ল কতবারই ত আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করেচি, কালকে রাত্তিরে ট্রেণেও আত্মহত্যার ইচ্ছা হয়েছিল। এটা সোজা মনে হত, কারণ স্ত্রীর মনে ভয় জন্মাবার এইটিই আমার পক্ষে সব চেয়ে ভাল উপায় বলে মনে হয়েছিল। আত্মহত্যা করতে পারলুম না, ভাবলুম—কেন আত্মঘাতী হব? ভাবচি এমন সময়ে আবার দরজায় ঘা মার্‌লে। পরে ভাব্‌ব ঠিক করে পিস্তলটি টেবিলের ওপর রেখে একটা খবরের কাগজ দিয়ে ঢেকে দরজা খুল্‌লুম, দেখ্‌লুম আমার স্ত্রীর বোকা বিধবা ভগ্নীটি সামনে দাঁড়িয়ে।

"এ সব কি ব্যাপার?" বলেই সে আর স্থির থাক্‌তে পার্‌লে না। ঝর ঝর করে তার দু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল।

"অত্যন্ত কর্কশ ভাবে আমি তাকে জিজ্ঞেস্ করলুম, "কি চাও আমার কাছে ?"

"জানতুম তার প্রতি কর্কশ ব্যবহার করা, বিশেষতঃ এই রকম সময়ে অত্যন্ত অন্যায়, তার ওপরে রাগ করবারও কোন কারণ ছিল না। তারত কোন দোষই নেই, আমাকে শুধু ডাক্‌তে এসেচে এইত। আমার তখন এমনি মনের অবস্থা যে কর্কশ স্বরই বেরুল।

"সে বল্‌লে, 'ডাক্তার বল্‌চেন সে এখনই মারা যাবে, বাঁচাবার কোন আশাই নেই।

"ডাক্তারের কথা শুনে আমার মনটা ভারি বিরক্ত হয়ে উঠ্‌ল। এই ডাক্তারের পরামর্শই আমার স্ত্রীর সর্ব্বনাশের মূল, আমার পারিবারিক অশান্তির প্রধান কারণ। আমার সোনার সংসার আজ ছাই হয়ে গেচে। থাক্, আমি অত্যন্ত বিরক্তির সহিত তাকে বল্‌লুম, "মারা যাবে ত কি হবে ? আমি কি করব ?"

"তার কাছে একবার যাও, দেখগে কি ভয়ানক ? বলেই একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে কাঁদতে লাগ্‌ল।

"প্রথমটা ভাবলাম—যাব, কি যাব না। তারপর তখনই স্থির করলাম আমার যাওয়া উচিত। হত্যা করলেও স্ত্রীর কাছে স্বামীর যাওয়া উচিত, শুধু উচিত নয় সে যেতে বাধ্য। তারপর আমার আত্মহত্যার কথা মনে করে ভাবলুম,—যদি আত্মহত্যারই দরকার হয় তারত সময় রয়েচে, কিন্তু স্ত্রীত আমার মুমূর্ষু। আমি আর উচ্চ বাচ্য না করে মাথাটি হেঁট করে শালীর পেছন পেছন চল্‌লাম। এবার দাঁত খিচুনি আর গালাগালের জন্য আমি প্রস্তুত হলাম, স্থির করলাম যত গালাগাল যে দেয় দিক, সব তিরস্কার, অপমান, নিন্দা নত মস্তকে নীরবে সহ্য করব, সমস্ত দুঃখ কষ্ট বিপদ বুক পেতে নেব।"

"আপনাকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়েচি, খুবই বিরক্ত করেচি, তবে আর বেশী কষ্ট দেব না।" বলিয়া পজ্‌নিশেফ্‌ একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলেন।

আমি বলিলাম, "না, না, আমি বিরক্ত হইনি মোটেই, কষ্ট কিছুই হয় নি। আমি অনেক কথাই নতুন শিখ্‌লাম।"

তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমার প্রত্যহের পরিচিত ঘরগুলোর ভেতর দিয়ে যখন যাচ্ছিলুম তখনও আমার আশা ছিল বুঝি তেমন কিছুই হয়নি! কিন্তু নানা রকমের এসিডের তীব্র গন্ধে অভিভূত হয়ে বুঝলাম ব্যাপারটি অতি সাংঘাতিক।"

"বারান্দা দিয়ে গিয়ে ছেলেদের ঘরের কাছেই দেখ্‌লাম মেয়েটা দাঁড়িয়ে সে আমার দিকে ভীষণ ভয়ের চাউনীতে তাকালে। মনে করলাম সব ছেলেই ওখানে আছে আর অমনি করে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েচে। আমি স্ত্রীর ঘরের কাছে গেলুম, ঝি দরজা খুলে দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি ভেতরে ঢুক্‌লাম।

"প্রথমেই তার রক্ত মাখানো সুন্দর সাদা পোষাকটি চেয়ারের ওপর পড়ে আছে দেখে চম্‌কে উঠলাম। সে বিছানায় পড়ে আছে; আমারই বিছানায়। আমার বিছানাটা কাছে ছিল বলে এইখানেই এসে পড়েচে, কতকগুলি বালিশ ঠেস্ দিয়ে ঢালু ভাবে শুয়ে আছে, হাঁটু দুটি উঁচু করা, জ্যাকেটের বোতাম খোলা, ক্ষত স্থানে কি যেন লাগানো রয়েচে। সমস্ত ঘরময় তীব্র ঔষধের গন্ধ। তার আহত মুখখানা ফুলে উঠেচে দেখে আমার সব চাইতে বেশী কষ্ট হল। চোখ আর নাক একেবারে কালো হয়ে গেছে, আমাকে ধরে রাখবার সময় কনুইয়ের ঘা লাগার ফলেই হয়েচে। তার সৌন্দর্য্যের কোন চিহ্নই তখন ছিল না। এই অবস্থায় তাকে দেখে আমি কাঠ হয়ে গিয়েছিলুম।

তার ভগ্নী তখন বল্‌লে, 'ওর কাছে যাও, কাছে যাও।'

"ভাব্‌লুম তার অনুতাপ হচ্ছে বোধ হয়, ক্ষমা করব কি তাকে? নিশ্চয়ই কর্‌ব, সে যে জন্মের মত চলে যাচ্ছে!"

"তার বিছানার কাছে গেলুম। অতি কষ্টে চোখ তুলে সে আমার দিকে চাইলে, একটি চোখে বড্ড ভয়ানক লেগেছিল। নিতান্ত ক্ষীণ ভাঙা ভাঙা স্বরে বল্‌লে, 'আমাকে খুন করেচ, এখন যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারবে।'

"তার মনের ভাবটি মুখের উপর ফুটে উঠ্‌তে চাইলে কিন্তু ভয়ানক দৈহিক-যন্ত্রণায় তা আর হল না। সে বল্‌লে, 'ছেলে মেয়ে তুমি পাবে না, ওদের আমি তোমাকে দেব না। আমার বোন্‌ ওদের নিয়ে যাবে।'

"যেটা তখন সব চেয়ে বেশী দরকারী কথা—তার অপরাধ, তার বিশ্বাসঘাতকতা, তার উল্লেখ করাও সে দরকার বোধ করলে না।

"তারপর দরজার দিকে চোখ ফিরিয়ে সে কেঁদে ফেললে, 'বেশ করেচ! কি করেচ একবার দেখ।"

"ছেলে মেয়েদের নিয়ে তার বোন দরজায় দাঁড়িয়েছিল।"

"একবার ছেলে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে তার সেই আহত কালো মুখখানার দিকে তাকালুম। এই প্রথম আমি আত্ম-বিস্মৃত হলুম, আমার অধিকার আর আমার গর্ব্ব—সবই ভুলে গেলুম। আমার হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা—যা নিয়ে ওত জ্বলে পুড়ে মরেচি, যার উত্তেজনায় এত বড় ঘৃণিত, এত বড় ভয়ানক কাজ করেচি সবই অতি তুচ্ছ অতি জঘন্য বলে মনে হল। এই প্রথম সব ভুলে গিয়ে দেখ্‌লুম তার ভেতরে মনুষ্যত্ব আছে। আমি এতই অভিভূত হয়ে গেলুম যে. তার পায়ে পড়ে, তার হাত দুখানি আমার হাতের মধ্যে নিয়ে চেঁচিয়ে বল্‌তে ইচ্ছা হল 'ক্ষমা চাই, আমি অপরাধী, আমায় ক্ষমা কর।'

"সে চোখ বুজে রইল, এত দুর্ব্বল যে কথা কইতে পাচ্ছিল না, চুপ করেই রইল। তার বিকৃত মুখখানা হঠাৎ কেঁপে উঠ্‌ল, মুখের উপর দিয়ে একটা ভ্রূকুটি খেলে গেল, তার দুর্ব্বল হাত দিয়ে আমাকে দূরে ঠেলে দিতে চাইলে। আমি বল্‌লাম, 'আমায় ক্ষমা কর।'

"মাথাটা একটু উঁচু করে উত্তেজনায় উজ্জ্বল চোখ আমার ওপর রেখে সে বল্‌লে! খুন করে ক্ষমা চাইতে এসেচ! ক্ষমার এখন আর কোন অর্থই নেই। হায়রে হায় যদি কোন রকমে বেঁচে থাক্‌তে পার!' সে যেন খুব ভয় পেয়ে হঠাৎ চমকে উঠে বল্‌লে, 'তোমার ইচ্ছা ত পূর্ণ করেচ। তোমায় আমি ঘৃণা করি।' ওঃ! তারপর সে প্রলাপ বক্‌তে লাগ্‌ল, মার আমায় মার খুন কর, আমি ভয় করি না। তাদের সকলকেই হত্যা কর, তাকেও হত্যা কর। ওঃ সে চলে গেচে! চলে গেচে! মৃত্যু পর্য্যন্ত তার এই প্রলাপ চল্‌তে লাগ্‌ল। সে কাউকেই আর চিন্‌তে পার্‌লেন না, তা সমস্ত জ্ঞানই তখন লোপ পেলে। সেইদিন দুপুর বেলাই সে এই পৃথিবীর কাছে বিদায় নিলে।

"তার মৃত্যুর পূর্ব্বেই বেলা আটটার সময় পুলিশ এসে আমায় থানায় নিয়ে গেল, থানা থেকে নিয়ে গেল জেলখানায়। এগার মাস ধরে আমার বিচার চল্‌ল, এই এগার মাসই আমি কারাগারে বাস করলুম। এই সময়ে আমার বর্ত্তমান এবং অতীত জীবন সম্বন্ধে ক্রমাগত চিন্তা করে করে জীবনের প্রকৃত অর্থ একটু বুঝ্‌তে পেরেচি। থাক্, তিন দিন পরে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল সেই ঘরে।"

তিনি আরও কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তখন তাঁর এতটুকু শক্তিও ছিল না যে, কান্না চাপিয়া তিনি কথা কহিতে পারেন। তার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, আত্ম-সংবরণ তখন তার পক্ষে অসম্ভব্। তাই তাঁকে খানিকক্ষণ চুপ করিয়াই থাকিতে হইল। তার পরে খুব

কষ্ট করিয়া তিনি এইটুকু বলিলেন, "সমাধির জন্য শবাধারে তাকে শায়িত দেখ্‌বার পর থেকেই আমি সব জিনিষেরই প্রকৃত রূপটি দেখ্‌তে আরম্ভ করেচি।"

তিনি আবার কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁর অবস্থা দেখিয়া আমিও স্থির থাকিতে পারিলাম না। কাঁদিতে কাঁদিতেই খুব তাড়াতাড়ি তিনি এই কয়েকটি কথা বলিলেন, "তাকে ঐ অবস্থায় দেখার পরই ভাল করে বুঝলুম আমি কি করেচি, তখন প্রাণে প্রাণে অনুভব করলুম শুধু আমিই তাকে হত্যা করেচি, অল্প সময় পূর্ব্বেও যে সজীব ছিল—চঞ্চল ছিল, সে তখন নির্জ্জীব—নিশ্চল, রক্তহীন মৃতদেহ বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে আছে। এ শুধু আমার দ্বারাই হয়েচে ত, আর এর কোথাও, কখনও, কারু দ্বারা প্রতিকার হওয়ার উপায় নেই। যে এইটুকু প্রাণে প্রাণে অনুভব করেনি, সে বুঝবে না। ওঃ।"

তিনি চুপ করিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া আমরা চুপ করিয়াই রহিলাম। তিনি কাঁদিতেছিলেন আর কাঁপিতেছিলেন। শেষে বলিলেন, "নমস্কার মহাশয়।" বলিয়াই একটা কম্বল মুড়ি দিয়া আমার দিকে পিছন করিয়া তাঁর জায়গায় তিনি শুইয়া পড়িলেন।

যে ষ্টেশনে আমার নামিবার কথা ভোর আটটার সময় সেই ষ্টেশনে গাড়ী আসিয়া থামিল। বিদায় লইবার জন্য তিনি যেখানে শুইয়াছিলেন সেইখানেই তার কাছে গেলাম। তিনি কি সত্যই ঘুমাইয়াছিলেন, কি অমনি শুইয়াছিলেন বলিতে পারি না, তিনি মোটেই নড়িলেন না। আমি তাহার গায়ে হাত দিলাম। তিনি তাহার কম্বলটি খুলিলেন, দেখিলাম জাগিয়াই আছেন। তার কাছে হাত বাড়াইয়া দিয়া, বলিলাম, "চললুম মশায়, নমস্কার।" তিনিও তাঁর হাত বাড়াইয়া দিয়া আমার হাত ধরিলেন, আর এমন একটু ক্ষীণ-করুণ হাসি হাসিলেন

যে, তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া চোখের জল রাখা আমার পক্ষে খুবই শক্ত হইয়া পড়িল।

যে ভাবে "নমস্কার" বলিয়া তিনি তাঁর জীবনের এই কাহিনী শেষ করিয়াছিলেন, ঠিক তেমনিই 'নমস্কার' বলিয়া আমাকে শেষ বিদায় দিলেন।

সমাপ্ত